শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ’র
মুহতারামা স্ত্রী’র **ঈমানদীপ্ত স্মৃতিচারণ**

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

শহীদ উস্তাদ আহমাদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ’র মুহতারামা স্ত্রী’র ঈমানদীপ্ত স্মৃতিচারণ

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

ভূমিকা

জনৈক কবি বলেছেন, "শহীদের আত্মদান জাতির তরে প্রাণ"।

এ কথা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত যে, একজন শহীদের মৃত্যুতে জাতির মাঝে এক জাগরনী উম্মাদনা সৃষ্টি হয়। মানুষ সেদিকে ধাবিত হয়। তারা চিন্তা ভাবনা করে যে, একজন ব্যক্তি এমনিতেই জীবন দিয়ে দিল? তার ধ্যান-ধারণা কি ছিল? তার এ চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য কি ছিল? তার কষ্টেভরা এ সফরের শেষ কোন মনযিলের উদ্দেশে ছিল? তার ব্যক্তিগত স্বভাব, চরিত্র ও গুনাবলী কি ছিল?

যেই জাতির মাঝে এই প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয়, তাদের মাঝে মুজাহিদীনের পরিচয় ও দাওয়াত ব্যাপক হয়। পরিণামে কিছু লোক ঐ দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে নিজ মুসলিম ভাই-বোনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত:পর সেও শহীদ হয়ে যায় এবং আরো অধিক লোক জেগে উঠার বীজ বপন করে যায়। এভাবেই সে পরবর্তী ফসল প্রস্তুত করে রেখে যায়।

শাহাদাতের এ ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে বংশ পরম্পরায় জাতির মাঝে (সফলতা অর্জনের উপযোগী) এক ইসলামী গণজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে দেয়। ফলে একটা সময় এমন আসে যে. গোটা জাতি এক হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ও ইসলামী জীন্দেগী টিকিয়ে রাখার জন্য দা'য়ী এবং সংরক্ষণকারী হয়ে যায়। এভাবেই একজন শহীদের মৃত্যু সমগ্র জাতির জন্য জীবন সঞ্চারণের কারণ হয়। সুতরাং প্রত্যেক যুগের আহলে ইলম, জ্ঞানী ও লেখকদের জন্য কর্তব্য হল- তারা উম্মাহর শহীদগনের জীবনী, চিন্তা-চেতনা, তাদের লেখাসমূহ ও ঈমানদীপ্ত ঘটনাগুলো জাতিকে জানিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। যাতে করে জাতি তার স্ব-জাতির স্বকিয়তা অনুযায়ী শহীদানের উপস্থিতি ও তাদের ত্যাগ-কুরবানীর বরকত থেকে বঞ্চিত না হয়।

প্রচলিত বাস্তবতা হল, কোন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচার, গোপন ও প্রকাশ্য গুনাবলী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত থাকে তার 'স্ত্রী'। কোন ব্যক্তির কৃতিত্বের ব্যাপারে তার স্ত্রী থেকে বেশি সত্য সাক্ষী আর কেউ হতে পারেনা।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে, স্ত্রী কর্তৃক তার স্বামীর কৃতিত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া এবং তার গুণাবলী ও কৃতিত্বের প্রকাশ করা নতুন কোন কথা নয়। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পিছনে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই যে, একজন সৌভাগ্যবান স্ত্রী তার সম্মানিত স্বামীর শানে বলেছিলেন:

انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين علي نوائب ا

"আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন, অভাবীদের জন্য উপার্জন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং সত্যের পথে কষ্ট সহ্য করেন।"

বিষয়টি হল, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নিজ স্বামীর কৃতিত্বের সাক্ষ্যদানের যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মেয়েদের জন্য (স্বামীর কৃতিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে) অনুসরণীয়ও হয়ে থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক যুগের মা-বোনেরা নিজেদের নেককার ও সৎ স্বামীদের জীবনী ও কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন।

নিচের আলোচ্য বিষয়টিও আমাদের একজন সম্মানিতা বোনের লেখা, এটা না তার নিজের আত্মজীবনী, আর না কোন শহিদের জীবনী। বরং এটাতো শুধু তার স্বামীর ভালবাসা মিশ্রিত ঈমানদীপ্ত সাহচার্যের কিছু স্মৃতিচারণ মাত্র। এটাতে তিনি হিজরত ও জিহাদের বাগান থেকে কিছু ফুল বাছাই করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যাতে এর সুঘ্রান দ্বারা আমরাও আমাদের ঈমান ও আমলকে সুশোভিত করতে পারি। কতইনা পবিত্র জযবাহ, যে ব্যক্তিই তা পড়বে সেই শহিদের জীন্দেগী ও তাঁর লক্ষার্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং হিজরত ও জিহাদের পরিপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করে ফেলবে।

আমরা আমাদের এ বোনের প্রতি সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এজন্য যে, তিনি এই উত্তম আমানত আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারন করুন। আমীন।

****

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২০০৬ সালের রমযানুল মুবারক আমার জন্য নতুন এবং দুর্লভ আনন্দের পয়গাম নিয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা আমার দীর্ঘ দোয়া উত্তম ভাবে কবুল করেছেন, এবং আমাকে আমার চাওয়া মতো নিয়ামত দান করে কৃতজ্ঞ করেছেন।

রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে কথা চূড়ান্ত হয়েছিল। পনের-বিশ দিনের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা রুখসতির(স্বামী কতৃক স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার) ব্যবস্থাও করেছেন। এই পরিবারের সাথে বিবাহের বিষয়টি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। এ বিবাহে কোন রকমের রং ঢং ছিলনা। সীমিত সংখ্যক এবং একেবারে কাছের কিছু মেহমান বিবাহে উপস্থিত ছিল। বিবাহ মসজিদে হয়েছিল এবং সেখান থেকেই রুখসতি হয়েছিল। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওলিমা(বিবাহের পর স্বামীর পক্ষ হতে যে মেহমানদারী করা হয়) হয়েছিল। অর্থাৎ বিবাহের প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পর আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। কোন জীবন এটা? এবং কেমন ছিল সে জীবন?এটা বুঝার জন্য কয়েক বছর পিছনে ফিরে যেতে হবে।

তখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল। আমি গ্রাজুয়েশন করে অবসর বসে ছিলাম। আমাদের এলাকায় ছাত্রীদের জন্য একটি তাফসীরুল কুরআন প্রশিক্ষণ কোর্সের ঘোষণা হল। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহনের দাওয়াত আমিও পেয়েছিলাম। যদিও আমরা একটি দ্বীনদার ভদ্র পরিবারের সদস্য ছিলাম তবুও দ্বীনহীন শিক্ষা গ্রহণের ফলে এর প্রভাব আমাদের উপর পূর্ণভাবে ছিল। এর ফলে আমি নামাজ, রোজার পাবন্দ ছিলাম ঠিক কিন্তু জীবনকে দ্বীনের উপর পরিচালনা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলামনা। দ্বীন জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য এবং সকল বিষয়ের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্যই এসেছে এর কোন অনুভূতিই আমার ছিলনা। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গি-ই সর্বদিকে পথপদর্শনের উৎস। তাই দ্বীনি ইলম অর্জন করার চিন্তা, ব্যকুলতা ও সেদিকে ধাবিত হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে ছিলনা।

আমার আম্মাজানকে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করুন, কেননা আমাদের মাঝে যা ভাল এবং কল্যাণকর রয়েছে তা আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীক ও অনুগ্রহের পর আমাদের মায়ের দীক্ষাতেই হয়েছে। দ্বীনের প্রতি তার মুহাব্বত ও আগ্রহের কারণেই নিজ সন্তানদেরকে দ্বীনের উপর আমলকারী ও ভাল মুসলমান হিসাবে তিনি দেখতে চাইতেন। আমাদের নামাজ, রোজা, পর্দা (প্রচলিত প্রথানুযায়ী হলেও) ইত্যাদি পালনে তারই বেশি অবদান ছিল।

এক্ষেত্রেও আম্মাজানের অসন্তুষ্টির ভয়ে এ প্রশিক্ষণকোর্সে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেখানে যেয়ে আমি আমার ধারণার বিপরীত পরিবেশ পেয়েছি। প্রশিক্ষণের পদ্ধতি আমার এতই পছন্দ হয়েছিল যে, পরবর্তীতে এটাতে আমি খুব আগ্রহের সাথেই অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই প্রশিক্ষণ আমাকে এক নতুন জগতের অর্থাৎ কুরআনের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তা'য়ালার তাওফীকে এই পথে জিন্দিগী পরিচালনা শুরু করেছিলাম।

আমাদের সমাজের লোকদের সাধারণ প্রবনতা এমন ছিল যে, যখন তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত এবং কোন কোর্সের আহ্বান আসত, তখন তারা বলত – "ভাই! দ্বীন সম্পর্কে আমরা যা জানি প্রথমে তার উপর আমল করে নেই"। অনেক সময় এভাবেও বলত যে, "না জানলে আমল করতে হয়না" অথবা "যদি একবার ক্লাসে অংশগ্রহণ করা হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালার কথা শুনে আমল না করা হয় তাহলে গুনাহ হবে"।

এসকল কথা সুস্পষ্টভাবে নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলা হত। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুসলমানের জন্য দ্বীনের বুনিয়াদী জ্ঞান ও প্রয়োজন পরিমাণ কুরআনের ইলম অর্জন করা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অজ্ঞ থাকার কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হবেনা বরং এটা উল্টো পাকড়াও এর কারণ হবে। সেসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন – "তোমাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু তোমরা ইলম শিক্ষা করা থেকে অজ্ঞ থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছিলে"।

কোর্সের প্রশিক্ষক এবং দায়িত্ব পালনকারিণী শিক্ষিকা ও খালাম্মাদের মনযোগ, কল্যানকামিতা, চরিত্র এবং ভালবাসা আমাদের মাঝে এমন বন্ধন সৃষ্টি করেছিল যে, কোর্স শেষ হওয়ার পরও ক্লাসে অংশগ্রহনের ধারাবাহিকতা শেষ হয়নি। এদিকে জাগতিক শিক্ষাও চলছিল। তখনো পর্যন্ত আমি জাগতিক শিক্ষাকে ঐ শিক্ষাই মনে করতাম, যার ফজিলতের ব্যাপারে কুরআনের জায়গায় জায়গায় আয়াত অবতীর্ন হয়েছে। দাজ্জালী ফেতনা এবং তার প্রকাশকে তখনো পরিপূর্ণ চিনতে পারিনি। একারণে ইচ্ছা ছিল জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে তা পরিপূর্ণ কাজে লাগানো।

পরের বছর আরো বড় আকারে কোর্স সংঘটিত হয় এবং এতে আমাদের শিক্ষিকা ছিলেন আরও জ্ঞানী, উচ্চ শিক্ষিতা, ভদ্র ও নম্র। তিনি যুবতিদের মেজাজ অনুযায়ী মাসায়েল বুঝানোর মত যোগ্য একজন খালাম্মা ছিলেন। এই খালাম্মাকে আমি 'উস্তাদজি' বলে সম্ভোধন করতাম।

পুরো শহর থেকে আসা ছাত্রীদের বড় একটি অংশ এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিল। ততদিনে আল্লাহ তা'য়ালার রহমতে কুরআন আমার সিনায় আসতে শুরু করেছে। লোক দেখানো পর্দার পরিবর্তে খাস পর্দা করা এবং জীবনের মাকসাদ বুঝা আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। কুরআনের নূর ক্ষনস্থায়ী ও ধ্বংসলীলা দুনিয়ার বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। সেসময় আখেরাত অর্জনের আগ্রহ অন্তরকে আলোকিত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উস্তাদজীকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যানসমূহ ও তাঁর স্থায়ী সন্তুষ্টির দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন। যিনি তার মূল্যবান সময় এবং মেহনতকে আমাদের মত বিকৃত মস্তিষ্কের গিট খোলার কাজে ব্যয় করেছেন। তাদের সময়, মনযোগ, ইলম এবং কুরআন পড়ানো ও বুঝানোর প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অনেকের অন্তরকেই আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের পর তাদের মেহনতের ফলেই আমাদের দাজ্জালী শিক্ষায় ভরপুর অন্তরসমূহকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কুরআন বুঝার প্রাথমিক অবস্থাতেই আল্লাহ তা'য়ালা এই বুঝ দান করেছিলেন যে, মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষ এক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর সে উদ্দেশ্য হল দ্বীন কায়েম করা। আর দ্বীন কায়েমের এই ফরজ দায়িত্ব আরামদায়ক গদিতে বসে পালন করা সম্ভব নয়।

ইসলাম ও কুফর-নিফাকের দন্দ্ব, তার পরিণতি, আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শন, সফলতা ও বিজয়, জান্নাত-জাহান্নাম ও তাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি, এগুলো হচ্ছে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ তা'য়ালা উভয় পথকে পাশাপাশি দেখিয়েছেন। সত্যপথের অনুসারী এবং তাদের পথ, তাদের উপর আসা পরীক্ষাসমূহ এবং দৃঢ়তার সাথে ঐ পথে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেন তাদের উত্তম পরিণাম কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা আছে। অন্য দিকে বাতিল ও পথভ্রষ্টদের বাহ্যিক উন্নতি এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

যখন এসব কিছু পড়া হয়ে গেছে এবং সে অনুযায়ী আ'মল করার চেষ্টা করছিলাম তখন আল্লাহর রাহে জিহাদ ব্যতীত এমন কোন মুক্তির পথ আমি দেখিনি, যার উপর চলে একজন মুসলমান দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজের ঈমানের হেফাজত এবং পরকালকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে পারবে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে আমার দুর্বলতা, অযোগ্যতা, জ্ঞানের সল্পতা ও অনুল্লেখযোগ্য আমল নিয়ে দোয়া করেছি এই বলে -

"হে আমার রব! আপনার সামনে পেশ করার মত কিছুই তো আমার নেই। আছে শুধু এ প্রাণটা, এটাও আপনারই দেয়া। একে আপনি আপনার রহমত দ্বারা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিন এবং নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার বান্দাগনের পথে আমাকে পরিচালিত করুন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তার দেয়া তাওফীক দ্বারা জিহাদ কামনা করেছি এবং এই রাস্তায় চলার মাধ্যম অর্থাৎ মুজাহিদও চেয়েছি। যেহেতু আমি মহিলা, তাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে আমার অংশগ্রহণের একটা উত্তম উপায় হল – কোন মুজাহিদের (স্ত্রী) সাথী হিসাবে থাকা। যার সংশ্রবে থেকে আমি জান্নাতের দিকে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে চলতে পারবো।

এই পথে চলার 'পাথেও কী' অথবা এই পথের 'কঠোর বাস্তবতা' কেমন এসম্পর্কে কোন জ্ঞান আমার ছিল না। শুধু একটা জযবা ছিল যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তার মুহাব্বতের রং ভরে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা এ জযবাকে জারি রাখুন এবং তার এ মুহাব্বতের রং স্থায়ী করুন। আমীন।

দু চার দিন নয় বরং এক বছরেরও অধিক সময় (আল্লাহ তা'য়ালা যতদিন চেয়েছেন) আমি আমার রবের নিকট নীরবে নিভৃত্বে এই দোয়া করেছিলাম -

"হে আমার রব! আপনার রাস্তায় চলার তাওফীক দান করুন। এ রাস্তায় চলার জন্য কোন নেককারের সংশ্রব দান করুন। এমন সাথী দান করুন যে ঈমান, ইলমে না'ফে(উপকারী ইলম), নেক আমল ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীতে আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে।

যার ঈমান আমার ঈমান থেকে অনেক মজবুত ও শক্তিশালী হবে, যাতে করে তার সংশ্রব আমার দুর্বল ঈমানকে শক্তিশালি করা এবং হেদায়াত ও কল্যাণের পথে উন্নতির কারণ হয়ে যায়"।

সেই সাথে এটাও চেয়েছি –

"হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন আমি যা চাচ্ছি তাতে আমার কল্যাণ নেই, তাহলে আমি আপনার কাছেই দোয়া করি এতে আপনি কল্যাণ লিখে দিন, এবং তা আমার জন্য নির্ধারন করে দিন"। অন্তরে একথা দৃঢ় ছিল যে, আল্লাহ তা'য়ালার দরবার থেকে ততক্ষণ মাথা তুলবনা, যতক্ষণ না তিনি নিজ রহমতে আমাকে একজন মুজাহিদের সাথী হিসাবে কবুল করবেন।

অবশেষে আমার রব দুয়া কবুল করেছেন এবং আমার মত অযোগ্য ও দুর্বল বান্দীর জন্য তাঁর উত্তম বান্দাদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত প্রিয় বান্দাকে নির্বাচন করেছেন।

১৪২৭ হিজরীর রমাজানুল মোবারকে একটি পয়গাম আসে। আব্বাজান পিতৃত্বের দরদের কারণে ভূমিকাতেই বললেন যে, তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে লালন পালন করেছেন। আদুরে মেয়েকে নিজ হাতে যুদ্ধের পরিবেশে পাঠানোর জন্য তার অন্তর প্রস্তুত ছিলনা। অত:পর আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন এবং তার মনকে এই সম্পর্কের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। আম্মাজান শুরু থেকেই পাশে ছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন।

রমজানেই এই সম্মন্ধ চূড়ান্ত হয়ে গেল। শাওয়াল মাসে বিবাহ হল এবং উঠিয়ে নিয়ে গেল। ওলীমার পরের দিনই কাঙ্ক্ষিত সেই সফর শুরু হয়ে গেল যা এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, যেন এ সফরের শেষ মাকবুল শাহাদাতের মাধ্যমে হয়। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু যেন না হয়, আমীন।

এখনতো আপনি জেনেই গেছেন যে, এটা কোন সফর এবং কেমন সফর?

জি হা। এটা নিজেকে আল্লাহ তা'য়ালার জিম্মায় দিয়ে দেয়ার সফর, রবের সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে সফর, হিজরতের সফর (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘর, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, নিজের শহর, দেশ, মনের চাহিদা, অভ্যাস এবং নিজের সমস্ত পছন্দ-অপছন্দ ছেড়ে দেয়ার সফর), আল্লাহর পথে জিহাদের সফর, সীমান্ত পাহাড়ায় অংশগ্রহণের সফর এবং ইনশাআল্লাহ জান্নাতের দিকে সফর। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে নিয়ামতে ভূষিত করেছেন তার প্রতিদানে শোকর আদায় করে শেষ করতে পারবো না।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই গুনাহগার, দুর্বল ঈমানওয়ালী এক বান্দির উপর এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাকে নিজের এক প্রিয় মুজাহিদ বান্দার সাথী হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। এরপর হিজরতের পথের জন্যও বাছাই করে নিয়েছেন। প্রশংসা শুধু আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত হক্কের উপর অবিচল রাখেন এবং হিজরতের এ সফর কাঙ্ক্ষিত মনযিলেই যেন শেষ করেন। অর্থাৎ মকবুল শাহাদাত এবং সেই সাথে রবের সন্তুষ্টি ও জান্নাতের জন্য যেন কবুল করেন।

বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে রমাজানুল মোবারকের শেষ দশকে, একদিন ঈশার নামাজের কিছু পূর্বে আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। ইতিমধ্যে সম্মানিতা হবু শাশুরির ফোন আসলো। তিনি পরিপূর্ণ দরদ ও ভালবাসা দিয়ে বললেন, "বেটি! রাস্তা বড় কঠিন। আবারো চিন্তা করে দেখ"। আমি উত্তর দিলাম - "আলহামদুলিল্লাহ, আমি দৃঢ় আছি"। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং দোয়া করলেন। ফোন শেষ করার পর আমি পুনরায় কুরআন হাতে নিলাম। যেখানে তিলাওয়াত বন্ধ করেছিলাম সেখান থেকেই দ্বিতীয়বার তিলাওয়াত শুরু করলাম। যে আয়াত পাঠ করছিলাম তার অর্থের উপর চিন্তা করলাম। সুবহানাল্লাহ! কুরআন পাক 'জীবন্ত' হওয়ার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। এটা ছিল সূরা হাজ্জ এর একেবারে শেষ আয়াত। যার অর্থ:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

”এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা প্রয়োজন, তিনি তোমাদেরকে নিজের ইবাদতের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নাম (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) মুসলমান রেখেছেন এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারে, আর তোমরা অন্যান্যদের জন্য সাক্ষী হতে পার। সুতরাং নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, তিনিই তোমাদের মুনিব, তিনি কতইনা উত্তম মুনিব এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হাজ্জ – ৭৮)

সেদিনের পর থেকে বাকি জীবন এ আয়াত ও এ আয়াতে বিদ্যমান সুসংবাদ আমার সাথে রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের ওলিমার পরের দিন সকাল বেলাই তিনি তার ল্যাপটপে একটি গজল ছাড়লেন। আমি সফরের প্রস্তুতিতে মগ্ন ছিলাম তাই প্রথমে খেয়াল করিনি। তিনি এটা লক্ষ্য করে আমাকে বললেন – “এটা আমি তোমার জন্য চালিয়েছি”। গজলের কথা গুলো ছিল,

مجھے تم سے محبت ہے اگر ایماں کو تم چاہو + اگر بارود کی خشبواور قرآں کوتم چاہو

“তোমার সাথে আমার মুহাব্বত থাকবে যদি তুমি ঈমান চাও

যদি বারুদের সুগন্দি এবং কুরআনকে চাও।”

আমি প্রশ্ন করলাম – “আপনার মুহাব্বত শর্তযুক্ত”? তখন তিনি নরম কিন্তু অত্যন্ত গাম্ভির্যের সাথে উত্তর দিলেন –“হ্যাঁ”। অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য উভয়ের দিক থেকে স্পষ্ট ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।

জিহাদের রাস্তা সর্বদাই বিপদসংকুল। এই রাস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল - এই পথে যাবতীয় তথ্য বা কাজগুলো গোপন রাখতে হয়। প্রথম দিন থেকেই এ লক্ষ্যে তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং ‘আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?’ এটা সফর শুরুর মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে আমাকে বলেছেন। কার সাথে যাচ্ছি? কোথায় থাকব? সামনে কি হবে? ইত্যাদির ব্যাপারে আমি বেখবর ছিলাম। জিহাদের পথে নিজেদের পরিকল্পনা, সংকল্প ইত্যাদি যাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন রাখা হয়। আর নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য যথাসম্ভব কম জানানোই উত্তম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকেও আমরা নিরাপত্তার বিষয়ে সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বনের শিক্ষা পাই।

আমাদের প্রথম মানযিল ছিল পশতুর এক আনসারের ঘর। মাশাআল্লাহ ঘরের সমস্ত সদস্যই আমাদের খুব ভালোবাসতেন। তারা খেদমত এবং আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা আমাদের জন্য করেছিলেন। সেসময় আমি পশতু ভাষার একটি অক্ষরও জানতামনা। কিন্তু গৃহকর্ত্রী ও বাচ্চাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসা এবং আপন করে নেয়াটা বুঝার জন্য ভাষা বুঝার প্রয়োজন ছিল না। এটা এমনিতেই বুঝতে পারতাম।

আমাদের নব বন্ধন সেখানেই দৃঢ় সম্পর্কের রুপ নিতে শুরু করেছিল। এ বন্ধনের ভিত্তি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। একারণে নববধুর চাহিদা না আমার অন্তরে ছিল, আর না তার মেজাজে ছিল। সুতরাং ঈমান ও ইয়াক্বিনের এ সফরের প্রথম পনের দিন (যখন নব বধুর হাত পায়ের মেহেদীও তখনো উঠেনি) কেটেছে পাহাড়ে উঠা-নামা করে। পাহাড়ে চড়া শিখার পাশাপাশি কঠিন সব রাস্তা অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ক্লাসিনকোভ ও পিস্তলের নিশানা ঠিক করার প্রশিক্ষণও এই সময়ে নিতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই প্রশিক্ষণই (বিবাহের) প্রকৃত মোহর, যা একজন মুজাহিদ স্বামী তার নব বধুকে দিয়েছিলেন।

ঐ পাহাড় থেকে নামার সময় আমার পায়ের আঙ্গুল সামান্য রক্তাক্ত হল। আমি তাকে বললাম – “এটা আল্লাহর রাস্তায় আমার প্রথম যখম, চাই তা যত ছোটই হউকনা কেন। যদি আল্লাহ তায়ালা এটা কবুল করে নেন, তাহলে বদলার দিক থেকে এটা অনেক দামি”।

এসময়ে আমার মৌলিক আক্বিদা ও চিন্তা-ফিকিরের বিশুদ্ধতার প্রশিক্ষণ চলছিল। তিনি আমার ব্রেন পরিষ্কার করার জন্য কিছু জিহাদী ভিডিও দেখান। তিনি সবসময় আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। কখনো আমাকে এ ধারণা দেন নাই যে, 'জিহাদ বিষয়ে তুমি কি জান'? বা 'তুমি তো মহিলা মানুষ, নিজের কাজ কর'।

বরং সবসময় প্রত্যেক বিষয়কে খোলাখুলি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতেন। উদাহরণ স্বরুপ - সেখানে থাকা অবস্থায় যখন এফ সি এর উপর মুজাহিদীনদের হামলার সংবাদ খবরের মাধ্যমে জানতে পারলাম তখন এ ব্যাপারে আমি বারবার উনাকে প্রশ্ন করছিলাম। নিজের বিভ্রান্ত জেহেনকে তার সামনে পেশ করলাম। তখন তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" আকিদার (আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা) বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে বর্ননা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারা আমার অন্তর ও জেহেনের গিঁট খুলে গেছে।

এছাড়া তার সংশ্রব আমার ঈমানী ও চিন্তার পরিশুদ্ধির উপকরণ হয়েছিল। সুমধুর কণ্ঠে প্রতিদিন তেলাওয়াতের অভ্যাস তাঁর ছিল। এমনটা খুব কমই হত যে, তিলাওয়াত করতে গিয়ে তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়নি। অথচ তখনও আমার তিলাওয়াতের ঐ অবস্থাই ছিল যা সাধারন দ্বীনদারদের হয়ে থাকে। রমাজানুল মোবারকে এক খতম তিলাওয়াত করতাম আর বাকি সারা বছরে কয়েক পারা তিলাওয়াত করতাম, তাও পরিপূর্ণ ভাবে পড়া হতনা।

একবারের ঘটনা আমি যখন কয়েকদিন যাবত নিয়মিত তিলাওয়াত করতে পারিনি। তিনি আমাকে বললেন, "কুরআন ব্যতীত জীবিত থাকার কল্পনা কিভাবে করা যেতে পারে?!!"

সুন্নতের গুরুত্ব এবং মনোযোগের সাথে ওযু করা আমি তার থেকেই শিখেছি। তাছাড়া তার নামাজ....এটা তো ছিল আরেক বিরল ব্যাপার। এতে তার বিশেষ বিশেষ আয়াত তিলাওয়াত করা, লম্বা লম্বা সিজদা-রুকুগুলো উল্লেখ করার মতো। এগুলো ছাড়াও নামাজে তিনি কখনই এদিক সেদিক দৃষ্টি দিতেননা(তার সম্পর্কে এটা আমার ধারণা, বাকি আল্লাহ তা'য়ালা ভাল জানেন)। নামাজরত অবস্থায় সাধারণত তিনি কামরায় কি হচ্ছে তা বলতে পারতেন না।

বেশী বেশী সালাম দেয়া এবং আগে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করার আমল তাঁর থেকেই শিখেছি। শহরে জীবন-যাপনের কারণে ঘরের লোকদের মাঝে পরস্পর একে অপরকে এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে সালাম দেয়ার অভ্যাস আমার ছিল না। অথচ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থা ছিল এমন - তারা রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি দুই ব্যক্তির মাঝে একটি গাছও অতিক্রম করার পর পুনরায় দেখা হত তাহলেও একে অপরকে পুনরায় সালাম দিতেন। আলহামদুল্লিাহ মুজাহিদীনদের মাঝে অধিক সালাম দেয়ার গুরুত্ব রয়েছে।

এমনি ভাবে রাতে শোয়ার পূর্বে নিজের উপর(সূরা ইখলাস,ফালাক্ব, নাস পড়ে) সুন্নতি ফুক দিয়ে শোয়া এবং তা গুরুত্ব সহকারে পালন করা তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। দৈনন্দিন সুন্নত আমলগুলোর পাবন্দি করার চেষ্টা করা - উদহারনস্বরুপ কোন ছোট কাজও বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত না করা, হেলান দিয়ে খানা না খাওয়া ইত্যাদিও তাঁর সোহবতে থেকেই শিখেছি।

চলুন আমরা সফরের কথায় ফিরে যাই। পশতুর সেই আনসারের বাড়িতে অবস্থানের সময়সীমা শেষ হয়ে আসলে আমরা পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমরা এখানে মাত্র ১৫ দিন ছিলাম। কিন্তু এর মাঝেই এই আনসার পরিবার আমাদেরকে নিজেদের পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের অকপটতা, মুহাব্বত, আন্তরিক খেদমত ভুলার মত না। তাই তাদের থেকে আমাদের বিদায়টা খুব বেদনাবিধুর/অশ্রুসজল হয়েছিল। এর মধ্যে আমাদের আনসার আমার জন্য টুপিওয়ালা একটা বোরখা নিয়ে এসেছিল। এ ধরণের বোরখা আমি আগে পড়িনি, তাই এটাতে অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে আমার স্বামী লুকিয়ে মুচকি হাসছিলেন। এরপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমরা হিজরতের ভূমির দিকে যাত্রা শুরু করি।

কয়েক ঘন্টার লাগাতার সফর আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। আমরা যখন হিজরতের ভূমিতে আনসারদের গ্রামে পৌঁছেছি তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। চাঁদের তারিখ (আরবি মাসের) শেষ দিকে ছিল এবং পূর্বদিক (দক্ষিণ ওয়াযিরিস্তান) অন্ধকারে ডুবে ছিল।

সম্ভবত এক-দু দিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। একারণে জায়গায় জায়াগায় কাঁদা ছিল। তিনি তো এসব বিষয়ে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আমার জন্য এসব কিছু একেবারেই নতুন ছিল। একজন স্থানীয় আনসারের ঘরের দরজায় করাঘাত করে তিনি আমাকে বললেন – "তুমি অন্দর মহলে মহিলাদের নিকট চলে যাও। আর আমি বাইরে পুরুষের সাথে (বৈঠক খানায়) থাকব"।

অপরিচত জায়গা, ঘন অন্ধকার, তার উপর অতিরিক্ত টুপি ওয়ালা বোরখা পরিহিত ছিলাম। এই টুপিওয়ালা বোরখা পড়ার অভ্যাস এর আগে ছিলনা। এটার চিকন ছিদ্র দিয়ে আলোর মধ্যেই দেখা মুশকিল, আর অন্ধকারে তো একেবারেই দেখা যায়না। বেশ অস্বস্তি নিয়েই সদর দরজা দিয়ে যখন ভিতরের দিকে পা বাড়ালাম তখন চারদিকে জমাট পানি আর কাঁদা দেখতে পেলাম। কয়েক কদম যাওয়া মাত্রই পিচ্ছিল পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম প্রায়। ইতিমধ্যে অভ্যর্থনার জন্য নির্ধারিত আনসারী মুহতারামা এগিয়ে এসে ধরে ফেললেন।

তার সাথে একটি রুমে প্রবেশ করি এবং সে রুম থেকে আরেক রুমে। রুমগুলোর ভিতরেও ঘোর অন্ধকার ছিল। নতুন এলাকা, নতুন পরিবেশ, না তাদের ভাষা আমি জানতাম, আর না তারা আমার ভাষা জানত। এমতাবস্থায় আমি চূড়ান্ত ভাবে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

ঘরে অবস্থানরত সকল মহিলা এবং বাচ্চারা একে একে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করছিলেন। কিন্তু অন্ধকারে না আমি কারো চেহারা দেখতে পারছিলাম, আর না তাদের কথা কিছু বুঝতে পারছিলাম। ঐ ঘরের মুহতারামা আমাকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু আমি যদি ঐ ভাষা বুঝতাম তবেইনা উত্তর দিতে পারতাম।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম কখন সকাল হবে। আলো আসলে অন্তত আমি কিছু দেখতে পারতাম। আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের উপর অত্যন্ত দয়ালু, তিনি তার এ বান্দির উপর এ পরীক্ষা দীর্ঘায়িত করেননি। আধা ঘন্টা পরই(যা আমার জন্য কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ মনে হয়েছিল) ডাক এসে গেল যে, আবার কোথাও যেতে হবে। রুম থেকে আবার ঐভাবেই পিছলে পড়তে পড়তে বাইরে এসে তাকে(স্বামীকে) পেয়ে কিছুটা সান্তনা পেলাম।

এরপর আরেক আনসারের ঘরে পৌছলাম। এখানে পূর্ব থেকেই অত্যন্ত প্রিয় একজন মুহাজির অবস্থান করছিলেন। সম্মানিত স্বামী আমাকে বললেন, 'এখানে তোমারই ভাষাভাষি একজন বড় বোন পাবে, যার থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে'। না জেনেই আমি তাঁর বর্ণনা শুনে ভেবেছি যে, বড় বোন হয়ত আমার থেকে বয়সে অনেক বড় হবে। আমি কল্পনা করছিলাম তিনি হালকা রংয়ের পোষাক পরিহিতা হবেন এবং সাদা রংয়ের দুপাট্টা উড়নী সাথে থাকবে।

বড় বোনকে দেখে আমি একটা ধাক্কা খেলাম! কারণ তিনি আমার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড় এবং তিনি সুন্দর ফিরুজা রংয়ের পোশাক পরিহিতা ছিলেন। তাকে প্রথম দেখাতেই আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি আমাকে উপরে তার থাকার রুমে নিয়ে গেলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমি তাকে বললাম আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোন বললেন যদি আপনি বিশ্রাম নিতে চান, তাহলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন।

আমি বলতে পারবোনা কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় আধা ঘন্টা পর আমার ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ খুলে দেখি বোন আমার নিকটই বসে আছেন। কয়েকদিন পর কথায় কথায় বোন আমাকে বলছিলেন - তুমিতো প্রথম দিন আমাকে তোমার মনের ভয়ের কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এদিকে আমি একা একা বসে ভয় পাচ্ছিলাম। (এই বোন আর তার স্বামী ২০১২ ঈসায়ী সনের রমজান মাসের শেষ রোজার ইফতারির কয়েক মিনিট পূর্বে পাকিস্তানি জেট বিমানের বোমাবর্ষনে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে নিন। আমীন।)

ইতিমধ্যে রাতের এক তৃতিয়াংশ অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল, তাই আনসারি বোনেরা ডাকতে এসে গেলেন। তাদের অভ্যাস ছিল ইসলামী নিয়মানুযায়ী সেহরীর সময় উঠে যাওয়া এবং ইশার পর পর ঘুমিয়ে পরা।

শীতকালীন রাত্র যে দীর্ঘ হয় এর অনুভূতি আমার সেখানে গিয়ে হয়েছিল। কারণ শহরে থেকে বিদ্যুৎ এর কারণে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন থেকে আমি গাফেল ছিলাম। যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন আমাদের অভ্যর্থনার জন্য লোকজন নিজেদের গরম বিছানা ছেড়ে প্রশস্ত চিত্তে এগিয়ে এলেন। তারা সর্বোচ্চ ভালবাসা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাদের গ্রহণ করে নিলেন। ততক্ষণাৎ মুরগী যবেহ করে ফেলা হল। তরকারী তৈরি হওয়ার সাথে সাথে খামিরা করে রুটিও তৈরি করা হয়ে গেল। ক্লান্তিময়

দ্বীর্ঘ সফরের পর মেজবানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং গরম গরম মজাদার খাবার ও চা আমাদেরকে একেবারে সতেজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া নিজ ভাষাভাষী স্বদেশি বোনের কারণে আমার ভরসাও দৃঢ় হয়েছিল।

পরবর্তী এক মাস আমরা ঐ ঘরেই ছিলাম। সে ঘরে অবস্থানের সময়টুকু আমি কখনোই ভুলতে পারবোনা। ঐ বোন এবং ভাই তাদের একটি রুম সমস্ত মালামালসহ আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ নিজেদের ঘরটি আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিলেন। এখানে এক রুমকে একটি ঘর বলার কারণ হল হিজরতের ভূমিতে সাধারনত একটি রুমেই একই পরিবারের সকল সদস্য একসাথে থাকেন। আর এই ঘরেই তাদের প্রয়োজনীয় সকল সামানা এবং চুলা, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি একসাথে থাকে।

আমাদেরকে নিজেদের রুমটি ছেড়ে দিয়ে বোন ও তার স্বামী পাশের একটি ছোট রুমে চলে যান। কখনো কখনো ঐ বোনের নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নেয়ার জন্য উপরের রুমে আসার প্রয়োজন পড়ত। আমাদের উপর তাদের ইহসান এমন ছিল যে - তারা স্বামী-স্ত্রী কখনোই কোন কারণে 'উফ' উচ্চারণও করেননি। উপরন্তু আমাদেরকে কখনো বুঝতে দেননি যে, তারা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে তারা সবসময় এটাই বুঝাতেন যে, এ সব তোমাদের, এতে তোমাদেরই অধিকার। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং জান্নাতে আমাদেরকে তাদের সাথী হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

আমার স্বামী দিনের অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে জিহাদের কাজে কাটাতেন। এসময়টাতে আমার এই বোনের দিন একসাথে সময় কাটতে লাগল। বোনের সাথে যত সাময় কাটাচ্ছিলাম ততয় আমার স্বামীর কথা সঠিক প্রমাণিত হচ্ছিল। আসলেই এই বোন থেকে আমি অনেক কিছু শিখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বোনকে ইলম, বুঝশক্তি ও প্রশিক্ষণের কৌশল দ্বারা সৌভাগ্যবান করেছিলেন। আমি যেহেতু আমলী জিন্দেগীতে নতুন তাই বৈবাহিক জীবনের নানান বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। একজন অভিভাবকের অভাব গভীরভাবে অনুভব করতাম। বোন আমার এই অভাবকে উত্তমভাবে পূর্ণ করেছিলেন। তিনি নানান বিষয়ে মুল্যবান পরামর্শ, উপকারী অভিমত ও কার্যকরী উপদেশ দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। এসকল কারণেই সময়ের সাথে সাথে বোনের সাথে বন্ধুত্ব ও মুহাব্বতের সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে যায়।

এখানে থাকাকালীন সময়েই আমি বুঝতে পারলাম যে, একজন পুরুষের জন্য স্ত্রী'কে সময় দেয়াটাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য ও অগ্রগণ্য বিষয় নয়। বরং আসল উদ্দেশ্য হল যে ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত আছে, সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হবে।

এ কারণেই আমার স্বামীর অধিকাংশ সময় জিহাদী কাজে ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত ছিল। তারপরও আমার মানসিক চিন্তা-ফিকিরের পরিশুদ্ধতার প্রতিও তাঁর পরিপূর্ণ খেয়াল ছিল। প্রথমত তিনি আমাকে শাইখ সাফারুল হাওয়ালীর কিতাব "সর্বশেষ কি হবে?" পড়তে দিয়ে বলেছিলেন – "তুমি প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুরো কিতাবটি পড়বে, আমি তোমার পরীক্ষা নিব"। ঐ সময় পর্যন্ত আমার কিতাবাদির সাথে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিলনা।

যাই হোক হাকিমের কল্যাণকর হুকুম অনুযায়ী কিতাব পড়া শুরু করে দেই। তবে কিতাবটি পড়ার সময় আমার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পড়েছি অর্থাৎ প্রথম পৃষ্ঠা দেখেছি, লেখকের নাম পড়েছি, পূর্বকথা, ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় যেগুলোকে জরুরী মনে করিনি, ছেড়ে দিয়েছি। শুধু কিতাবের মূল অংশটি পড়েছি। তারপর একদিন তিনি সুযোগ পেয়ে পরীক্ষা নেয়ার জন্য বসে পড়লেন। সময়টা ছিল শীতকালের দিনের বেলা। এসময় রোদের তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি রুমের বাইরে বারান্দায় একটি পিলারের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন এবং আমাকেও বসার জন্য বললেন। আমি যেহেতু সবে মাত্র শহুরে জীবন ছেড়ে এসেছি, তাই কাপড় ময়লা হয়ে যাবে মনে করে থেমে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে জোরপূর্বক মাটিতেই বসিয়ে দিলেন(অনেকদিন পর বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটাও আমার প্রশিক্ষনের অংশ ছিল। এটা এইজন্য যেন আমার অন্তরে নমনীয়তা আসে এবং কৃত্রিমতা ছেড়ে যেন আমি প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে পারি)।

পরীক্ষা শুরু হল।প্রথম প্রশ্ন ছিল: "কিতাবের নাম এবং লেখকের নাম কি"? আমি এর উত্তর দিয়ে দিলাম। অত:পর প্রশ্ন করলেন – "লেখক কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন? এবং তিনি কোন এলাকার?" আমি পেরেশান হয়ে বললাম – "কিতাবের মূল অংশের কোথাও এ কথা লিখা নেই"। এটা শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – "প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগে লেখকের পূরো পরিচয়

আছে"। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়তে বলার উদ্দেশ্য কি। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে কিতাব পড়ার নিয়মাবলীর বিষয়টা আমার পরিপূর্ণ শিখা হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

একইসাথে বড় বোন আমাকে চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এই পরিবেশে আমাকে কিভাবে থাকতে হবে, আনসারদের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি করতে হবে, তাদেরর হক্ব জেনে তা আদায় করার পদ্ধতি, তাদের মনোরঞ্জনের ব্যাপারে গাফেল না হওয়া, তাদের ভাষা শিখা এবং এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার বিষয়টি তিনি আমাকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এছাড়াও আনসারদেরকে মন খুলে মেহমানদারি করা, প্রয়োজনে কৌশলে তাদেরকে শরয়ী বিষয়ের প্রশিক্ষণও দিয়ে দেয়া এবং তাদের দুর্বলতাগুলোকে সংশোধন করার পদ্ধতিও আমি এই বোন থেকে শিখেছি।

আমি স্পষ্টভাবে সবসময় এটা স্বীকার করি যে, বিভিন্ন সমাজে নিজের ইজ্জত রক্ষা করা, সম্মান অর্জন করা, স্থানীয় আনসারদের সাথে মুহাব্বত কায়েম করা, তাদের থেকে মুহাব্বত অর্জন করা এবং সে সমাজের প্রথা অনুযায়ী বসবাসের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে আমার স্বামী আর এই বোন হাতে-কলমে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করি, আমার এই দুই মুরুব্বিকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম মর্যাদা দান করুন। আমীন।

বাস্তবতা হল আনসারদের এ হক্ব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . ﷺ . قَالَ " الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا – أَوْ شِعْبًا – وَاسْتَقْبَلَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ " .

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আনসারগণ যেন দেহের আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আভরণ। আনসারগণ যদি কোন গিরি পথে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য গিরি পথে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি পথেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। [সুনানে ইবন মাজাহ - ১৬২]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . ﷺ . " رَحِمَ اللَّهُ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ " .

আম্‌র বিন আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের প্রতিও দয়াপরবশ হোন। [সুনানে ইবন মাজাহ - ১৬৩]

তিনি আরো বলেন "যদি আনসাররা এক ঘাটিতে থাকে আর মুহাজিররা অন্য ঘাটিতে থাকে, তাহলে আমি আনসারদের সাথে তাদের ঘাটিতেই থাকব। তারপর এই দোয়া করলেন " হে আল্লাহ আপনি আনসারদের উপর রহম করুন, এবং তাদের সন্তানদের উপর ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের উপর রহম করুন। তিনি আরো বলেন তোমরা কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও? যে, লোকেরা ধন সম্পদ নিয়ে ঘরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে" আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আনসারদের ভালবাসা এবং তাদের হক্ব বুঝে তা আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন

আনসারদের সাথে চলার সময় আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম কথা হল, আমাদের জীবন-পদ্ধতি ও প্রতিদিনকার চাহিদা আর তাদের সরল জীবনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে মুহাজিরদের নিয়ে আনসারদের মাঝে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া, ঘরের সামানা পত্র নিয়ে আগ্রহ দেখানো এবং তা চাওয়ার বিষয়গুলো প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। এমনটা ঘটেই থাকে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের অন্তর যেন সংকীর্ণ না থাকে বরং এসকল বিষয় মানিয়ে চলতে হবে। চেষ্টা করতে হবে

আমাদের খাবার-দাবার এবং পোষাকাদী যেন এমন স্থানে না থাকে যেখানে সহজেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। এক্ষেত্রে একটা মূলনীতি হচ্ছে - আমাদের মালামাল আমরা নিজেদের হেফাজতে রাখবো।

যদি আমরা এটাই চাই যে, আমাদের সকল মালামাল আমাদের সামনেই রাখব আবার এটাও কামনা করব যে, সেদিকে কেউ তাকাতে পারবেনা, কেউ তা চাইতেও পারবেনা এবং কেউ এ নিয়ে আলোচনাও করতে পারবেনা, এমনটা ভাবা তো ঠিক না। একটি গরিব, সহজ-সরল পরিবার, যারা আরাম আয়েশের জীবন সম্পর্কে জানে না, তাদের বাচ্চাদেরকে কেন আমরা (আমাদের মাল সামানা প্রদর্শন করে) পরিক্ষায় ফেলবো? এটা তো এমন যে, একদল প্রচন্ড ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে রকমারি খাবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাছাই করা হচ্ছে, আর এসকল খাবারের সুঘ্রান ও দর্শন তাদের ক্ষুদাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তারপর তাদেরকে বলা হল যে, তোমরা এগুলোর দিকে তাকাবে না, এর থেকে খেতেও পারবেনা, আর তা চাইতেও পারবেনা!!! যদি তারা ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তখন আমরা তাদেরকে মুর্খ, বে-ওকুফ, চোর, পকেটমার ইত্যাদি নাম দিয়ে দেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আসল কথা হচ্ছে, সংশোধন তাদের নয় বরং আমাদরে হওয়া দরকার। কারণ আমাদের প্রয়োজনকে স্বীমাবদ্ধ করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। নিজেদের জীবন যাপনের পদ্ধতি(লাইফ স্টাইল), পোশাক-পরিচ্ছদ যথাসম্ভব তাদের জীবন পদ্ধতি ও তাদের পোশাকের কাছাকাছি করার চেষ্টা করবো। নিজেদের মালামাল সকলের সামনে না রেখে যথাসম্ভব ঢেকে রাখার চেষ্টা করবো। নিজেদের টাকা পয়সা এবং দামি জিনিসপত্র নিজেদের হেফাজতে রাখব, যাতে করে কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করতে না হয়, আর নিজেদেরও যেন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট লজ্জিত হতে না হয়।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনাই - আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন আনসার ছিল। তার দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে ছিল, যার দ্বারা আমরা মাঝে মাঝে কিছু সদাই পাতি আনার ব্যবস্থা করতাম। একদিনের ঘটনা - সে ঘরের মুরুব্বি আমাদেরকে খবর পাঠালেন, আমরা যেন সেই বাচ্চাকে (আগে) টাকা দিয়ে বাইরে না পাঠাই। বরং সে যখন সামানা নিয়ে আসবে তখন তার দাম জিজ্ঞাসা করে যেন টাকা আদায় করি। কারণ সে তো বাচ্চা মানুষ - আর বাচ্চাদের অন্তরে যে কোন সময় পদস্কলন আসতে পারে। সুতরাং তাদের হাতে বেশি টাকা দিয়ে যেন তাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলি!

অতএব আমি-আপনি বুকে হাত রেখে একটু চিন্তা করে দেখি যে. কাল যদি এই আনসাররা আমাদের বাড়িতে মুহাজির হয় আর আমরা আমাদের বাড়িতেই থাকি এবং এই মুহাজিরদেকে যদি নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিতে হয় - যাদের ভাষা, রুসম-রেওয়াজ, চাহিদা, চাল-চলন সবকিছুই আমাদের থেকে ভিন্ন - তাহলে বলুন আমরা তাদের সাথে কতটুকু ধৈর্য, সহনশীলতা ও মুহাব্বতের আচরন করতে পারব?! যার আশা এখন আমরা তাদের থেকে করি!!

বাস্তবতা হল - আমরা তো বিল্ডিংয়ে থেকে অভ্যস্ত, তাই ঐ আনসারদের কাঁচা (মাটির) ঘরে থাকার সময়ে এই ঘরের যত্নের ব্যাপারটা আমরা আমলে নেই না। এর ফলে যথাযথ মেরামতের অভাবে (কাচা ঘরকে যথাযথ হেফাজত এবং সময়মত মেরামত না করার কারণে) তাদের বাচ্চা ও মহিলাদের নানারকম পেরেশানীতে পরতে হয়। তা সত্বেও আনসারগণ নিজেদের জান, মাল, খেদমত ও আশ্রয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। যেভাবে তারা আমাদের সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরন করেন এটা শুধু তাদেরই বৈশিষ্ট। নিঃস্বন্দেহে তাদের প্রকৃত শুকুরগুজার গুণের কারণেই তারা এমনটা করতে পারেন। প্রকৃত সম্মানদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আনসারদের মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কেমন তা পরকালেই আমরা জানতে পারব ইনশাআল্লাহ।

বড় বোন যেহেতু অনেক বছর যাবত তার মুজাহিদ স্বামীর সাথে রয়েছেন, তাই তার দ্বীনি চিন্তা-চেতনা অত্যন্ত মজবুত ছিল। একদিন আমাদের উভয়ের স্বামী যথারীতি জিহাদের কাজে বাইরে ছিলেন। বোন আমাকে বললেন, "চল আমরা আজ পুনরায় নিয়্যাতকে নবায়ন করে নেই। যেহেতু সহীহ নিয়্যাত ব্যতীত কোন আমল কবুল হয়না। এমন যেন না হয় যে, আমাদের স্বামীগণ আল্লাহ তা'য়লার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সফলতা সবই অর্জন করে নিল আর আমরা কোন নিয়্যাত না থাকার কারণে অথবা গলদ নিয়্যাতের কারণে খালি হাতে রয়ে গেলাম"। তার এ কথা আমার অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে। তখনই আমরা দুজন সেখানে বসেই নিজেদের নিয়্যাতকে নবায়ন করে নেই যে - *আমরা আমাদের স্বামীদের কারণে হিজরত ও জিহাদের পথ অবলম্বন করিনি। বরং আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময় পাওয়ার জন্য তা করেছি। আমরা আমাদের জান ও মালকে*

জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। আমাদের হিজরত এবং জিহাদ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই। আল্লাহ না করুন যদি কখনো আমাদের স্বামী না থাকে, অথবা এই পথে অবিচল না থাকে তখনো আমরা এই পথকে ছাড়বো না এবং জিহাদের উপর অবিচল থাকব ইনশা আল্লাহ।

বোন তো কয়েক বছর পূর্বেই নিজের নিয়্যাতের সনদের উপর সীলমোহর এটে নিয়েছেন(আমি এমনটাই ধারনা করি)। এখন আবার আমার সাথে নবায়ন করে নিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নিয়্যতের ব্যাপারে দৃঢ়পদ রাখুন এবং তার পথে মাকবুল শাহাদাৎ থেকে বঞ্চিত না করুন। আমীন।

আমার হিজরতের জীবনের আনন্দময় একটা ঘটনা এখন বলবো। এক দিন তিনি ঘরে এসে আমাকে বললেন, "দেখবে তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি?" এটা বলে তার উভয় হাতকে আমার সামনে ধরলেন। তার হাতে কোন অলংকার, কাপড় অথবা সুগন্দি ইত্যদি কিছুই ছিলনা। বরং সেখানে ছিল একটি ছোট চকচকে পিস্তল। এটা তিনি আমার জন্যই এনেছিলেন। আমার পিস্তল!!! এটাই আমার প্রথম অস্ত্র ছিল। একজন মহিলা স্বর্ণ অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যে আনন্দ পায় আমি তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল আমি এ পিস্তল পেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তা অন্য কোন মহিলা হাজারো উপহার পেলেও পাবে না। তাছাড়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে অস্ত্র পাওয়ার মর্যাদায় আলাদা। অস্ত্র সংগ্রহ আর ব্যবহারে কষ্ট যত বেশি হবে সাওয়াবের ওয়াদাও তত বেশি। এই চিন্তা আমার আনন্দকে আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

বোন এবং অন্যান্যদের নিকট কয়েক মাস থাকার পর আমাদের একটি ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমরা সেখানে চলে যাই। ঐ সময় পর্যন্ত আমার স্থানীয় ভাষার জ্ঞান বলতে কাউকে স্বাগত জানানোর কয়েকটি শব্দের মঝে সীমাবদ্ধ ছিল। দুই রুম, বৈঠকখানা এবং বারান্দাসহ পুরোটাই আনসারদের চার দেয়ালের ভিতরেই ছিল। আনসারদের ঘরে "আ'দে" নামে একজন সম্মানিতা ব্যক্তি ছিলেন যাকে আমি "মা" বলে ডাকতাম। তার স্বামীকেও আমি বাবা বলতে শুরু করেছিলাম। তিনিও (তার ঘরের লোকদের সাথে ও তার স্বামীর সাথে কথা বলার সময়) সর্বদা আমাকে নিজের মেয়ে বলেই সম্ভোধন করতেন। তাদের দুজন যুবক ছেলে ছিল। বাবা ও দুই ছেলে দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতেন।

সেসময়টাতে আমার স্বামীও নিজের কাজে দিনের বেলা তো বাইরে থাকতেনই, অধিকাংশ সময় রাতেও বাইরেই থাকতেন। একারণে প্রায়ই আমাকে একা একা থাকতে হতো। এই একাকী থাকার কারণে একটি বড় ফায়দা যেটা হয়েছে সেটা হল, আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ভালোভাবে চেষ্টা করা শুরু করলাম। তাছাড়া কিতাব পড়ার ব্যাপারে বরাবরই আমার একটা অনিহা ছিল। এখন এই অবসর সময়ে কিতাব পড়ার অভ্যাসটাও হয়ে গেল। আমি লাগাতার পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম। তারপর থেকে কোন না কোন কিতাব পড়ার মধ্যে লেগে থাকতাম। আলহামদুলিল্লাহ।

কিতাবের পর আমার একাকিত্বের সাথী ছিল "আদে" নামে পরিচিতা সম্মানিতা মা। তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা দশ-পনের মিনিট, কখনো আধা ঘন্টা সময় আমার সাথে বসে কথা-বার্তা বলতেন। এসময়ে আমি তার কাছ থেকে পশতু ভাষা শিখতাম। এই পশতু ভাষা শিখার ঘটনাটিও বেশ মজার।

ঘটনা হল - শুরুতে আমি পশতু ভাষা একটুও পারতাম না। আর "আদে"রও পশতু ছাড়া অন্য কোন ভাষা সামান্যও জানা ছিলনা। যখন আদে আমার কাছে আসতেন এবং কথা বলতেন তখন আমি (আমার স্বামীর শিখানো পদ্বতিতে) তার চেহারার ভঙ্গি দেখে সে অনুযায়ী নিজের চেহারার মধ্যে ঐ ভাবটা ফুটিয়ে উঠানোর চেষ্টা করতাম। যাতে তিনি এটা মনে না করেন যে, আমি তার কোন কথা বুঝিনা এবং তার মন যেন ভেঙ্গে না যায়। এভাবে শুনতে শুনতে কিছু কিছু বুঝতে পারতাম কিন্তু তারপরও সম্পূর্ন কথা বুঝতামনা।

একদিন আদে আমার নিকট আসলেন এবং তার ছেলের সম্পর্কে কোন লম্বা ঘটনা শুনিয়ে গেলেন - যা আমি একটুও বুঝতে পরিনি। সে রাতে আমার স্বামী ঘরে আসেননি। পরের রাতে যখন আসলেন তখন তিনি আমাকে বললেন, আদের ছেলেকে কিছু লোক ভুল বুঝে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুদিন পর সুস্থ ও নিরাপত্তার সাথে ছেড়ে দিয়েছে। আমি অত্যন্ত পেরেশান হলাম যে, আদে আমাকে কেন বললেননা? যখন আদেকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি আমার দিকে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে একথা কে বলেছে'? আমি আমার স্বামীর নাম বললাম। তখন তিনি বললেন, 'তাকে

কে বলেছে? আমি বললাম, 'আপনার ছেলে'। অত:পর তিনি আমাকে বললেন, 'পরশু আমি তোমাকে এত লম্বা কাহিনী শুনিয়েছিলাম সেটা তাহলে কি ছিল?

আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমি যে কি পরিমাণ লজ্জিত হয়েছিলাম। এভাবেই আদের কাছ থেকে আমি আস্তে আস্তে এমনভাবে স্থানীয় ভাষা শিখে নিয়েছি যে, পরবর্তীতে অত্যন্ত সহজভাবে স্থানীয় মহিলাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতাম।

হিজরত এবং জিহাদের ময়দানে থাকা অবস্থায় স্থানীয় ভাষা শিখার প্রয়োজনীয়তা বুঝা, এর প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং এর জন্য মেহনত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় লোকদের অন্তরও ঐ সকল মুহাজিরদের জন্য অধিক প্রশস্ত হয় যারা তাদের ভাষা শিখার আগ্রহ রাখে এবং এর জন্য মেহনত করে। এটা মানতে হবে যে, আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বললে(যদি শ্রোতা আমাদের ভাষা বুঝে) যতটুকু প্রভাবিত হবে, তার চেয়ে অধিক প্রভাবিত হবে যদি স্থানীয় ভাষায় বলতে পারি।

বাস্তবতা হল স্থানীয় ভাষা জানার চেষ্টা না করার অর্থ হল আমরা নিজেদেরকে বড় এবং আনসার ও তাদের সকল বিষয়কে ছোট মনে করি। বাস্তবে হয়তো এমনটা আমরা মনে করি না। কিন্তু স্থানীয় ভাষার শিখার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ ও গাফলতি এমনটাই নির্দেশ করে। আনসারদের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতে তৈরি হবে বিষয়টা এমন না। বরং তাদের সাথে মিলে-মিশে থাকা এবং তাদের সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আনসারদের হক্ব আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের উপর আনসারদের একটি বড় হক্ব হল, আমরা যেন তাদের জন্য আখেরাতের ফিকির করি। তাদের পরকালীন সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে আগ্রহী হই। আমরা সর্বোচ্চ ভালবাসা, দরদ ও কল্যাণকামিতার মাধ্যমে যেন আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জোড়ানোর চেষ্টা করি। তাদের মধ্যে আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি করা আমাদেরই দায়িত্ব। এটা তো ইনসাফ হতে পারেনা যে, আমরা তাদের থেকে দুনিয়াবী সকল সেবা গ্রহন করব আর এর বিনিময়ে তাদের আখেরাতের কল্যাণের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকব। কিন্তু একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, দরদ ও কল্যানকামিতার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সাথে 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে'র অনেক পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের প্রথমটা করতে হবে, দ্বিতীয়টিতে হাত দেয়া যাবেনা। এটা এইজন্য যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিষয়টা বেশ স্পর্শকাতর। এর স্পর্শকাতরতার দরুন হেকমত ও কৌশল না জানার কারণে আমাদের মত লোকেরা মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যশীল করার পরিবর্তে দ্বীন থেকে দূরে সরানোর কারণও হয়ে যেতে পারি।

সুতরাং আমরা অন্তরিকভাবে আনসারদের পরকালীন সফলতার জন্য আগ্রহী হব এবং তাদের জন্য মেহনত করব। আর এ মেহনত ঐ সময় ফলদায়ক হবে যখন আমরা তাদের ভাষা সম্পর্কে জেনে তাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলবো। আর এভাবেই তাদের সাথে আমাদের আন্তরিক ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

ঐ পাঁচ মাসের মধ্যে (যেসময়ে আমি একাকি ঘরে থাকতাম তিনি কম সময়ই ঘরে থাকতেন) যতটুকু সময় তার থেকে আমি পেয়েছি তিনি আমার দ্বীনি বিষয়াদি সংশোধনের দিকে খেয়াল রাখতেন। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সকাল সন্ধার যিকরসমূহ ঠিকমত পড়ছ তো?" হ্যাঁ সূচক উত্তর শুনে প্রশ্ন করলেন, "সবগুলো দুয়ার অর্থ কি জানা আছে"? এর উত্তরে না বলায় তিনি বললেন, "সবগুলো দুয়ার অর্থ শিখে নাও। আমি শুনব(এবং পরবর্তীতে শুনেছেনও)"। উদ্দেশ্য ছিল দোয়াগুলো যেন আমি খুব ধ্যানের সাথে পড়ি এবং তার গুরুত্ব যেন অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

ঐ সময় তিনি তার সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন, সাথে সাথে আমিও এর কিছু অংশ পেতে থাকি। আকিদার বিষয়ে মাওলানা ইদ্রিস কান্ধালভী রহ: এর প্রিয় কিতাব "আকায়েদুল ইসলাম" শব্দে শব্দে পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন এবং মৌলিক আক্বীদাগুলো সাবলিল ভাষায় আমার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ সময় যখন তিনি লক্ষ্য করলেন আমার তিলাওয়াতে তাজবিদ ও মাখরাজের কিছু ভুল হচ্ছে। তখন আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩ নং পারা পুরোটা তাজবিদের সাথে এমনভাবে পড়িয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ এর পরে আমার মৌলিক ভুলগুলো ঠিক হয়ে গেছে। নিশ্চই এটা আমার উপর উনার করা অনুগ্রহগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি অনুগ্রহ।

এরপরেও যেহেতু আমি দীর্ঘ একটা সময় দাজ্জালি জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত ছিলাম তাই আমার অন্তর ও দেমাগ তখনও পশ্চিমা শিক্ষার ধ্বংসাত্মক প্রভাব দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত ছিল। এ কারণে আমি তাকে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করতাম যে, আমাকে কোন কাজ দিন। আমার দ্বারা কোন কাজ করান, আমি অবসর বসে থাকতে পারিনা ইত্যাদি। তিনি বলতেন - খানা রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘরের প্রতি খেয়াল রাখা, আমার প্রতি খেয়াল রাখা, মেহমানদের সেবা করা এ সবগুলোই তোমার কাজ, এর চেয়ে বেশি কি কাজ তুমি চাও? কিন্তু আমি যে অজ্ঞতার যুগে বড় চাকরী করাকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে রেখেছিলাম, তাই আমার কাছে এসমস্ত ঘরের কাজ এবং দায়িত্বকে কিছুই মনে হতনা। আমি তখনো এমন কোন কাজ চাচ্ছিলাম যার মাধ্যমে আমার সফলতা ও অগ্রগামীতা বুঝা যাবে। তখন আমার মনে হবে আমিও দ্বীনের কাজে ও জিহাদী অঙ্গনে অনেক বড় অবদান রাখছি এবং আমার ডিগ্রি বৃথা যায়নি।

সর্বশেষ একদিন তিনি সান্তনা দেয়ার জন্য আমাকে বললেন, "কাজ চাও? তুমি কাজ করবে? কে তোমাকে নিষেধ করেছে! তুমি কি আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছ? পুরা কুরআন মুখস্থ করে নিয়েছ? বুঝে নিয়েছ এবং আমলে পরিনত করে নিয়েছ? সব মাছনুন দোয়া মুখস্ত হয়ে গেছে? যদি না করে থাক তাহলে কি এগুলো কাজ নয়? তুমি তোমার দ্বীনের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার সুযোগ ও অবসরকে কাজে না লাগিয়ে দুনিয়াবি কাজে সময় নষ্ট করতে চাইছো?

এই কথাগুলোর মাধ্যমে এক বৈঠকেই তিনি আমার চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, শোন বিবি! কাজ করার মতো কাজ সেটা নয় যা দেখে গোটা দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে, তুমি একটা কিছু করছ। বরং করার মত কাজ তো সেটাই যার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তাছাড়া এ অনুভূতি অন্তর থেকে স্বার্থপরতা এবং অহংকারকেও বের করে দেয়।

স্বাভাবিকভাবে মানুষ চিন্তা করে থাকে যে, আমি সে কাজই করব যা আমার জ্ঞান বলবে। অথচ আমি কি? এবং আমার জ্ঞানের মাপকাঠি কি? আমার জ্ঞান যা বলবে তাই কি সঠিক? আমি যা আজকে ভাল মনে করছি আগামীকালও কি এটাকেই ভাল মনে করবো?

তিনি আরও বললেন, "বিষয়টা হল - আমার রব তো আমাকে স্বাধীন ছেড়ে দেননি। আমার মর্যাদা এবং সম্মান আমার নিজের মত করে পছন্দ করে নেওয়ার এখতিয়ার আমার রব আমাকে দেন নি। আমার মর্যাদা কোন পথে তা আমার রব ঠিক করে দিয়েছেন। তাই তার দিকে অগ্রগামী হবার চেষ্টা কর, সেদিকে অগ্রসর হও এবং এ পথে নিজের যোগ্যতা অর্জন কর। অগ্রগামী হবার যত ইচ্ছা ও আশা রয়েছে তা এই পথেই পূরণ করার চেষ্টা কর। আর এই পথে অগ্রগামী হবার কোন শেষ নেই। যদি ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে থাক তাহলে তাতে ইহসান এর স্তরে পৌঁছার চেষ্টা করতে থাক। এরপর নফল ইবাদতের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাক। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া জীবনব্যবস্থা অনন্য, কিন্তু আমাদের জিন্দেগীর গাড়ি কোন দিকে রওয়ানা দিয়েছে? কার উদ্দেশ্যে? কোথায় গিয়ে থামবে? এব্যাপারে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে"।

আলহামদুলিল্লাহ তিনি আখিরাতের চোখে সফলতা-ব্যর্থতা, উপকারী- অপকারী এবং এধরনের পরিভাষার অর্থগুলো আমার কাছে পরিস্কার করে তুলে ধরলেন। আমি দুনিয়ার চোখে যেগুলোকে সফলতা ও ব্যর্থতা বলে মনে করতাম আখিরাতের চোখে সেগুলোর অসারতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। এভাবেই তিনি আমার অন্তরের পরিশুদ্ধির চেষ্টার মাধ্যমে আমাকে পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন নিরন্তর। আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন।

তাছাড়া তার দীক্ষা আমার নিকট এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি মহিলাগণ তাদের সীমানায় থেকে নিজেদের দায়িত্বগুলোকে উত্তমভাবে পুরা করতে থাকে এবং নিয়্যাতকে সহিহ করে নেয় - তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ইনশাআল্লাহ জিহাদ ও রিবাতেরর (পাহারার কাজ) সওয়াব পাওয়া যাবে। এমনিতেই তিনি যখন একদিন আমাক জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তুমি এখানে (জিহাদের ময়দানে) কেমন আছ"? তখন আমি বললাম, " আমিতো শুধুমাত্র একজন হিজরতকারিনী"। তিনি মুচকি হেঁসে বললেন, "শুধু হিজরতকারিনী নয়, বরং তুমি আমি আমরা সকলে রিবাতে রয়েছি"। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আপনিতো রিবাতের কাজে (জিহাদের পথে সীমানা পাহারা দেওয়ার আমল) লেগে আছেন। কিন্তু আমি তো মহিলা মানুষ, আমি তো ঘরেই অবস্থান করছি"। তখন তিনি আমাকে বুঝালেন - "মুরাবিত্ব এমন স্থানের পাহারাদারদেরকে বলে যেখানে তারা শত্রুদের আশংকা করে এবং শত্রুরাও তাদেরকে ভয় করে। আর যে জায়গায় আমরা রয়েছি তা ফ্রন্ট লাইনের (প্রথম স্তরের) অবস্থানে

রয়েছে। এখানে দুশমন আমাদের থেকে সতর্ক থাকে এবং আমরাও তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকি। সুতরাং আমরা সকলে রিবাত্বে রয়েছি"। এটা জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার মধ্যে একটা সংশয় ছিল যে, জিহাদে আমার অংশ কি? যাই হোক একথাগুলো শুনে আমার বক্র চিন্তা-চেতনার কিছুটা সংশোধন হয়েছিল। তারপর তিনি আমার মত অযোগ্য মানুষ থেকে টুটা ফাটা কিছু কাজও নিয়েছেন। এতে করে কাজ করতে যেয়ে আরও নতুন কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। অনেক নতুন বিষয়ও শিখেছি। আরো কিছু বিষয় সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে নিজের সহযোগিতা মূলক কাজ দ্বারাও আমার অর্জন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

আমার এই নসিহত মূলত ময়দানের জিহাদে আগ্রহী নারীদের জন্য। কারণ তারা হিজরতের পূর্বে চিন্তা করে এবং বলে থাকে যে, আমরা মুজাহিদীনদের এই এই খেদমত করতে চাই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি আমাদেরকে হিজরতের তাওফীক দেন, তাহলে আমরা মুজাহিদদের জন্য খানা রান্না করব, তাদের কাপড় ধুয়ে দিব এবং তাদের সেবা করব। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিজরতের তাওফীক দিয়ে দেন, তখন দেখা যায় ঐসকল মুজাহিদীনের খেদমত কখনো কখনো তাদের নিজেদেরই করতে হয়। অথচ মুজাহিদ এবং তার পরিবারের লোকদের খেদমত করা অনেক ফজিলতপূর্ণ বিষয়। আর এসকল খেদমতের মাধ্যমেও মহিলাগণ নিজেদেরকে জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করাতে পারেন।

একদিন তিনি আমাকে এবং পাকিস্তান থেকে আগত কিছু মেহমানকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে মেহমানগণ অন্যদিকে চলে গেলেন। এরপর তিনি আমাকে ক্লাশিনকোভ এবং বিভিন্ন ধরণের পিস্তলের নিশানা ঠিক করানোর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এটা আমার জীবনের একটি আনন্দময় দিন ছিল। পূর্বে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে, হিজরতের একেবারে প্রথমদিকে ক্লাশিনকোভ এবং অন্যান্য পিস্তলের নিশানা ঠিক করার অনুশীলন আমি করেছিলাম।তবে তখন সরাসরি ফায়ার করার সুযোগ মিলেনি। আজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

২০০৭ এর শুরুর দিকে অবস্থা খুবই নাযুক হয়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্তে ভয় হত যে, এখনই হয়ত পলায়ন কিংবা আত্মগোপন করতে হবে। আনসাররাও ভয়ে ছিলেন, বরং মুহাজিরদের তুলনায় তাদেরই ভয় বেশি ছিল। কারণ তাদের বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, জমি-জামা সবকিছুই ঝুঁকিতে ছিল। মুজাহিদীনের সাথে কারো সম্পর্কের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কাছে রিপোর্ট যাওয়া মাত্রই তারা ঐ আনসারের সবকিছু ধ্বংস করে ফেলত। সর্বদা আমরা এই ভয়ে থাকতাম যে, এই নাযুক পরিস্থিতির কারণে কখন যেন আনসারগণ আমাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

একদিন সে এলাকায় সৈন্যদের টহল দেয়ার (ঘুরাঘুরির) খবর ছড়িয়ে পড়ল। আমরা আনসারদের এলাকার যে ঘরটাতে থাকতাম, সে ঘরের একেবারেই নিকটেই মুজাহিদীনদের একটি ক্যাম্প(কেন্দ্র) ছিল। এই ক্যাম্পটার উপর অতর্কিত হামলার আশংকা ছিল। এসময় হঠাৎ করে "আদে" আমার নিকট আসলেন। আমি ঐ সময় একজন মুহাজিরা বোনের সাথে ছিলাম। এদিকে আমার স্বামী মার্কাজে (মুজাহিদীনদের ক্যাম্পে) আক্রমনের আশংকার কথা শুনেই আমাকে একথা বলে মুজাহিদীনের সাথে চলে গেলেন যে, এসময়ে সাথীদের হেফাজত ও সংখ্যা বৃদ্ধির স্বার্থে আমার সেখানে থাকা আবশ্যক।

"আদে"র এ সময়ে আসাতে আমার মনে প্রথমে এ কথাই আসল যে, এখন অবশ্যই তিনি আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলবেন। কিন্তু না বরং তিনি বললেন যে, "বিপদ অনেক বেশি। তোমরা আমাদের সাথে আমাদের ঘরের অন্দর মহলে আমাদের থাকার রুমে চলে আস"। আমরা নারীরা হা করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যখন বিপদ মাথার উপর এসে গেছে তখনও তারা নিজেদের পরিবর্তে আমাদের হেফাজতের চিন্তা করছেন। শুধু কি তাই? তারা আমাদেরকে ঘর থেকে বের করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরের অন্দর মহলের রুমে আসার জন্য বলছেন। এ অবস্থাকে সেই অনুভব করতে পারবে, যে এমন ভীতিকর নাযুক পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে। এমন নাযুক পরিস্থিতিতে যখন তার সন্তানাদী, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ সবকিছুই দুশমনের চোখের সামনে, তখন শুধুই আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে আশ্রয় দেয়া অনেক শক্তিশালী ঈমানের পরিচয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমীন।

ওইখানে অতিবাহিত করা পাঁচ মাসের শেষের দিকে আমাদের এখানে ভিন্ন দেশের এক নব দম্পতি আসেন। ঠিক সেভাবে আসলেন, যেভাবে আমরা বোন ও ভাইজানের নিকট এসেছিলাম। আমাদের দুই রুমের এক রুম তাদেরকে দিয়ে দিলাম।

আর এভাবে খুব সহজেই আমার একটি বান্দবী ও বোন মিলে গেল। এরপর আস্তে আস্তে লোকদের সমাগম বাড়তে শুরু করে। এসময় অনেকেই হিজরত করে আসতে শুরু করেন। এক মাস পর আরেক বোন তার স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে আমাদের এখানে আসলেন। আলহাদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের অন্তরকে সংকীর্ণ হতে দেননি। ততক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যে, দুই রুমে তিন পরিবার মিলে-মিশে থাকবে। আর স্বামীগণ পর্যায়ক্রমে(পালা বন্টন করে) আসবেন। চার বা সাড়ে চার মাস এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। একদিনও কারো অন্তরে এ সংকীর্ণতা আসেনি যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পরিবারের কারণে আমার স্বামী বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারেননি।

ঘরে ঈমানের অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশ ছিল। এখানে সকলেই তার ঈমানের প্রতি যত্নবান ছিলেন। একে অপরের সাথে মুহাব্বত, সামনে বেড়ে খেদমত করার আগ্রহ, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং কুরবানীর ক্ষেত্রে একে অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। আল্লাহর জন্য একে অপরকে মুহাব্বত করা, একে অপরকে প্রাধান্য দেয়া এবং পরস্পর সাহায্য করার মাধ্যমে অতিবাহিত দিনগুলোতে আমাদের মাঝে যে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছিল তা দিন দিন দৃঢ় হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ তা আজও আছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদের এই মুহাব্বতকে তার জন্য খালেস করে নেন এবং নিজ রহমতে শেষ বিচারের দিন তার আরশের ছায়া তলে একত্রিত করেন - যেদিন অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবেনা। আমীন।

আমরা নারীরা চেষ্টা করতাম প্রতিদিন সকলে মিলে একসাথে বসে কিছু পড়তে। সাধারনত এ তালিমে কুরআনের তাফসীর, হাদীস এবং সাহাবাদের জীবনী থাকত। সাথে সাথে জিহাদের ফাজায়েল থেকেও উপকৃত হচ্ছিলাম। মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি ভাল কাজে লেগে থাকা যেন দৃষ্টি আপন মানজিল থেকে অন্যদিকে সরে না যায়।

আমরা এখানে যে সকল নারীরা হিজরত করে এসেছি প্রত্যেকেই শহরের বাড়িঘর, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এসেছি। তাই আমাদের প্রত্যেকের ফিকির এমন থাকতো যে - শহরের বাড়ি ছেড়ে এসে এখানকার ঘর গুলোর সাথে আমাদের অন্তর যেন জুড়ে না যায়। আর যে উদ্দেশ্যে শহর, বাড়ি-ঘর এবং আপন লোকদেরকে ছেড়ে এসেছি তা যেন ভুলে না যাই। অর্থাৎ হিজরতের মূল উদ্দেশ্যই হল দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এটা কিছুতেই ভুলা যাবেনা। এটাই মুহাজিরা সকল নারীদের ফিকির ছিল।

এরই মধ্যে লাল মসজিদের লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটে। সেসময় আমরা সবসময় রেডিওতে কান লাগিয়ে রাখতাম। আর অন্তর ও জবান দুয়ায় ব্যস্ত থাকতো। যেদিন মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী রহ. এর আম্মার শাহাদাতের খবর পাই, সেদিন যেন আমাদের সকলের অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। তারপর মাওলানা আব্দুর রশীদ গাজী ও অন্যান্য ছাত্রীদের শাহাদাতের খবর আমাদের উপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার মত মনে হচ্ছিল। আমরা সকলে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে বার বার এ দুয়া করছিলাম - হে আল্লাহ! আমরা এ জুলুম থেকে মুক্ত। (এই জুলুমে আমাদের কোন হাত নেই)।

ঐ দিনগুলিতে তিনি প্রায়ই বলতেন "যেদিন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই প্রশ্ন করবেন যে, যখন তোমাদের দেশে তোমাদেরই ভাই-বোনদেরকে শুধুমাত্র এই কারণে হত্যা করা হয়েছিল যে, তারা বলেছিল আমাদের রব আল্লাহ! ঐসময়ে তাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিলো। তখন তোমরা তাদের জন্য ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কি করেছিলে? তখন আমরা কী উত্তর দিব?"

ঐ বছরই কিছু কারণে আমাদের পাকিস্তান যেতে হয়েছিলো। এতদিনে আমরা টুপি ওয়ালা বোরকা পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং এটাই এখন আরামদায়ক মনে হয়। অধিকাংশ মুহাজিরা মহিলাদের অনুভূতি এমনি ছিল। আর বাস্তব কথা হলো এই ধরণের বোরকা দ্বারাই আসল পর্দা রক্ষা হয়। কারণ এতে বয়স, আকৃতি কিছুই বুঝার উপায় নেই। আর ভাইজানের ভাষায় 'এই বোরখা দেখতে এতই বে-মানান ও আকর্ষণহীন যে এর দিকে একবার তাকালে পরে আর তাকাতে মন চায় না।' মূলত এটাই ছিল বোরকার আসল উদ্দেশ্য।

যাই হোক পাকিস্তানের অধিকাংশ এলাকায় যেহেতু টুপি ওয়ালা বোরকার প্রচলন নেই, তাই আমরা এক আনসারের ঘরে রাত্রি যাপন করি। পরের দিন যখন আমরা পরবর্তী মনযিলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানকার প্রচলিত বোরকা তথা কোর্ট ও স্কার্ফ পড়ে নিলাম। এই বোরকায় হাত-পা আবৃত ছিলো, কিন্তু চোখ সমান্য দেখা যাচ্ছিলো। বাইরে বের হতেই তিনি (স্বামী) তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, "তুমি এটা কী পরেছো"? আমি তো হয়রান হয়ে গেলাম! তিনি বলতে

লাগলেন, এই আকর্ষণীয় বোরকায় দেহ ঢাকলেও তা মানুষের দৃষ্টি আরো বেশি আকর্ষণকারী - যা দ্বারা বোরকার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এরপর থেকে আমি আর কখনও এই ধরণের বোরকাকে নিজের জন্য আরামদায়ক মনে করে পড়িনি।

২০০৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের মাজমুআর(মুজাহিদ গ্রুপ)অনেক সাথী প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় ড্রোন হামলার শিকার হয়। তখন তার কাজ অনেক বেড়ে গেলো। কখনো সাথীদের শরয়ী তরবিয়াতে সময় কাটাতেন। কখনো রনাঙ্গনের সাথীদের উৎসাহমূলক কথা বলতেন। কখনো দীর্ঘ বৈঠকে ব্যস্ত থাকতেন, আবার কখনো ইনতেযামী বিষয়েরও তদারকী করতেন। এতকিছু সত্বেও ঘরে এসে কখনোই নিজের পেরেশানীর বোঝা আমার উপর চাপাতেন না। শত ক্লান্তি আমার সাথে নরম ব্যবহার করতেন। সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন, আমাকেও বলতেন ‘হাসিমুখে থাকবে, এতে পয়সা খরচ হয় না।’

তার ইলম অর্জনের আগ্রহ ছিলো খুব বেশি। ঘরে থাকাকালীন অধিকাংশ সময় বই পড়ে কাটাতেন। কিন্তু তা সত্বেও শুকনো খিটখিটে মেজাজে থাকতেন না। তিনি খুবই রসিক ছিলেন। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সম্ভোধন করে কোন কৌতুক বা মজাদার কথা বলতেন, যাতে আমার মন ভালো থাকে।

ঐসময়ে তার ছোট ভাই আব্দুর রহমান (যার বয়স ছিলো মাত্র সতের বছর এবং সে হাফেযও ছিলো) আহত মুজাহিদদের খেদমতের উদ্দেশে চলে আসল। সে এমন চমৎকার আখলাকের অধিকারী ছিলো যে, অল্পদিনেই সব মুজাহিদদের প্রিয়ভাজন হয়ে গেলো। কিছুদিন পর সে আঙ্গুরা আড্ডা নামক রণাঙ্গনে চলে গেলো।

সময়টা ছিল আগস্ট মাস। তিনি ঘরে ছিলেন না। হঠাৎ করেই আমার মনে অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। আমি আমার স্বামী ও সকল মুজাহিদের জন্য দুআ করলাম। মন কিছুটা প্রশান্ত হলে পরে ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের পরপরই তিনি ঘরে আসলেন এবং দ্রুত বলতে লাগলেন - ‘রণাঙ্গনে রাতে ড্রোন হামলা হয়েছে। অনেক সাথী শহীদ হয়েছেন। আমি সেখানে যাচ্ছি। এদিকে আব্দুর রহমানের খবরটাও পেলাম না, সে তো ওখানেই ছিলো।" একথা বলে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলেন এবং বারান্দায়ই সেজদায় পড়ে গেলেন। সেজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখন তার চোখে পানি ছিলো, মুখে হাসিও ছিল। বললেন – "আব্দুর রহমানের খবর পেয়েছি, সেও শহীদ হয়ে গেছে"। একথা বলে রওয়ানা হয়ে গেলেন, এই যাওয়ায় সম্ভবত পরের দিন ফিরে এসেছিলেন।

ঐ ড্রোন হামলায় বারো জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। তিনি রণাঙ্গনে পৌঁছতে পৌঁছতে দশজনের জানাযা পড়া হয়ে গিয়েছিলো। তার ছোট ভাই ও অপর এক মুজাহিদের জানাযা বাকি ছিলো। ঐ মুজাহিদের লাশ প্রায় অক্ষত ছিলো, কিন্তু আব্দুর রহমানের লাশের নামে একটি পুটলি বাঁধা ছিলো। তিনি তার ভাইয়ের বিক্ষিপ্ত লাশের টুকরা দেখার জন্য পুটলি খুলতে চাইলেন। কিন্তু পুটলিতে হাত দেওয়া মাত্রই তা থেকে রক্ত বের হতে লাগল। তখন সাথীরাও তাকে খুলতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা’আলা আপন দয়ায় তার মন প্রশান্ত রাখলেন। তিনি ক্যাম্পে অবস্থানরত সাথীদেরকে ঐ দিন জিহাদ ও শাহাদাতের ফযিলতের উপর দরসও দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলার ওয়াদা সত্য। আল্লাহ তা’আলা শহীদের পরিবারের উপর সাকীনা নাযিলের যে ওয়াদা করেছেন তা আমি এই শাহাদাতের সময় তার ও তার পিতামাতার ক্ষেত্রে স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ।

সম্ভবত জুলাই মাসের শেষের দিকের এক রাতে আমি ড্রোন হামলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সকাল হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে এ কথা বলে বের হয়ে গেলেন যে, আমি খোঁজ খবর নিয়ে আসি। কয়েক ঘন্টা পর ফিরে এসে বললেন "তুমি তাড়াতাড়ি প্রস্তত হও। শাইখ আবু খাব্বাব মিসরীর ঘরে ড্রোন হামলা হয়েছে(তিনি ছিলেন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তার গোটা জীবন তিনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন। বয়সও ষাটের বেশি ছিলো)। তিনি ও তাঁর নয় বছরের ছেলেসহ তার জামাতা এবং অল্প বয়সি নাতনি এই হামলায় শহীদ হন। এছাড়া আরবের এক ভাইও এই হামলায় শহীদ হয়েছেন - যিনি একজন আলেম ও মুজাহিদীনদের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। এই হামলায় তার স্ত্রীও গুরুতর আহত হন।

আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি শাইখের স্ত্রীর অপারেশন হয়ে গেছে। তখন তিনি বেহুশ অবস্থায় ছিলেন। সেখানকার মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন অপারেশনের আগে বেহুশ অবস্থায়ও তিনি মুখে حسبنا الله و نعم الوكيل পড়ছিলেন। তিনি অনেক ধৈর্যশিলা, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারিণী মহিলা ছিলেন। আমি হাসপাতালে তাঁর কাছে তিন দিন ছিলাম। তিনি বারবার তাঁর স্বামী, সন্তান ও ঘরের অন্যান্যদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিন্তু আমরা তাকে কিছুই বলিনি। তাঁর বাম হাতের কয়েক জায়গায়

ফ্রেকচার হয়ে গিয়েছিলো। কনুইয়ের নিচে বড় একটা অংশের মাংস উড়ে গিয়ে হাড্ডি দেখা যাচ্ছিলো। শরীরের অনেক জায়গায় মিসাইলের টুকরা প্রবেশ করেছিলো। একারণে বুক থেকে পেট পর্যন্ত কয়েক জায়গায় অপারেশন করতে হয়েছে।

পরের দিন যখন নার্স ড্রেসিং করতে আসলো, তখন আমি আপার (শাইখের স্ত্রী) ডান হাত ধরে রাখলাম। আরেকজন নার্স তার মাথা ধরে রাখলো আর বাতাস করতে থাকলো। ড্রেসিংকারী নার্স যখন তার যখমে জীবাণুনাশক ঔষধ দিলো তখন ক্ষতস্থান থেকে ফেনা বের হচ্ছিল আর আপারও অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার কষ্টের পরিমাণ আমি বুঝতে পেরেছি এইজন্য যে, তিনি আমার হাত এত শক্ত করে ধরেছিলেন যে, আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগলো। ওষুধের প্রভাবে তার পুরো শরীর ঘেমে গিয়েছিল। এতদসত্বেও তার মুখ দিয়ে উফ শব্দ পর্যন্ত বের হলো না। এসময়েও তার মুখে "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ", ও "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল" এর যিকির জারী ছিলো।

পরের দিন আপা আমাদের ড্রোন হামলার রাতের ঘটনা শুনালেন। আপার ভাষ্যমতে - "রাতে যখন ড্রোন হামলা হলো তখন আমরা বাড়ির উঠানে ঘুমন্ত ছিলাম। পুরুষরা উঠানের একদিকে ছিলো, আর মহিলারা ছিলো অন্য দিকে। আমার যখন চোখ খুলল তখন দেখি আমার দিকে একটি আগুনের শিখা আসছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার নাতনীকে দূরে সরিয়ে দিলাম যাতে সে আহত না হয়। এরপর আমি আহত অবস্থায় ঘরে ছুটে গেলাম। আমার তখন একটাই চিন্তা; এখনই লোকজন এসে পড়বে। লোকজনের আনাগোনায় বায়তুল মালের আমানত উধাও হয়ে যেতে পারে। তাই খুব শিঘ্রই আমাকে আমানতের হেফাযত করতে হবে"। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিকে সেনাবাহিনীর হামলার আশঙ্কা ছিলো, অন্যদিকে আমার স্বামীর কাজের চাপও অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "মুজাহিদরা সেনা ক্যাম্পে বড় ধরনের হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি সহ অনেক মুজাহিদ তাতে শরীক হবো। শাহাদাতের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ তাদের ক্যাম্পে প্রবেশ করতে হবে। দোয়া করো, আমি যেন শহীদ হই"।

আমাদের বিবাহের পর প্রথমবার একটি অপারেশনে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জন্য শাহাদাতের দুআ কোরো"। তখন তাঁর যাওয়ার পর আমি কেঁদে কেঁদে তাঁর শাহাদাতের জন্য দুআ করলাম। এর একটু পরেই শয়তান আমাকে ধোকা দিয়ে দিল। আমার মনে একথা উদয় হলো যে, "হে আল্লাহ! এখনই না"। এরপর আগের চেয়ে আরো বেশি কেঁদে কঁদে দোয়া করেছিলাম "হে আল্লাহ! এখনই শহিদ হিসেবে কবুল করে নিয়েন না"। পরে তওবা করেছিলাম এমন কাজ আর করব না। এরপর আল্লাহ আমার অন্তর মযবুত করে দিলেন।

যাই হোক, এবার তিনি দ্বি-প্রহরের কিছু পূর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, "আজ রাত একটা বা দেড়টার দিকে অভিযান শুরু হয়ে যাবে। মুজাহিদীনদের সফলতা ও আমার শাহাদাতের জন্য দোয়া করবে"। তখন পর্যন্ত আমার অন্তর প্রশান্ত ছিল। আমি এশার পর সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাত প্রায় একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই ফায়ারিং এর আওয়াজ শুরু হলো, আমি বুঝতে পারলাম নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি আবার সবার জন্য দোয়া করে ঘুমিয়ে গেলাম।

সকালে আমি ফজরের নামাজ পড়ে উঠানে বের হলাম। তখন "আদে" নামক আনসারী মায়ের উঠান থেকে তাঁর ছেলের সাথে মায়ের কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম। ছেলে বলছিল, 'মা! সে তো সিংহের মত লড়াই করেছে'। এ ধরণের আরো কিছু কথাবার্তা শুনে আমার মনে হলো আমার স্বামীর কথা বলছে। আমি কান খাড়া রেখে যিকির আযকারে লিপ্ত হয়ে গেলাম। পরে জানতে পেরেছি আনসারী মায়ের এই ছেলেও রাতের হামলায় শরিক ছিলো। একজন স্থানীয় বংশোদ্ভুত লোকের কাছে(যারা ছিল বাহাদুরিতে প্রশিদ্ধ) তাঁর প্রশংসা শুনে বুঝলাম যে, আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বীরত্বপূর্ণ গুণের একটি অংশ আমার স্বামীকেও দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আনসারী মা আমার কাছে এসে আমার এবং তাঁর মাতা-পিতা, ভাই-বোন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি পেরেশান হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "আদে"! তাঁর কী খবর? সে কি ভালো আছে"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ! খবর ভালো, সে চলে আসবে"। একটু পরে আবার এসে বললেন, "তোমার স্বামীর কোন কাপড় থাকলে দাও"। এবার আমার সন্দেহ ইয়াক্বীনের রুপ ধারণ করতে লাগলো। আমি বললাম, "আদে! কাপড় কেন

প্রয়োজন? কাপড় তো তিনি সর্বদা সাথেই নিয়ে যান"। কিন্তু মা কোনও উত্তর দিলেন না। বললেন, "কাপড় দিয়ে দাও"। আমি তখন ঘরের অবশিষ্ট একসেট কাপড় দিয়ে দিলাম।

মাগরিবের আজান হলো। আমি অজু করে জায়নামাজে দাড়ালাম। এমন সময় দরজায় আওয়াজ হলো। তাঁর কড়া নাড়ার আওয়াজ চিনতে পেরে বললাম, "দরজা খোলা আছে, ভিতরে চলে আসুন"। কিন্তু তিনি প্রবেশ না করে আবার আওয়াজ দিলেন। আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন তখন আমি হাসিমুখে বললাম, "কি? আহত হয়েছেন"? তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঘরে তো আসতে দাও"। আমি কবুলিয়তের দোয়া করলাম এবং বিস্তারিত জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, "আগে নামায পড়ে নিই"।

একটু পরেই আনসারী মা-বাবা ও তাদের ছেলে ঘরে আসার অনুমতি চাইলো। আমি ভিতরের কামরায় চলে গেলাম। মা ভিতরে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে"? আমি বললাম, "ধারণাতো করেছিলাম, কিন্তু আপনি বলেননি কেন"? তিনি বললেন, "আমি তো সকাল থেকেই জানি, কিন্তু তোমাকে বলার সাহস হচ্ছিলনা বিধায় বলিনি"।

মেহমানরা যাওয়ার পরই তিনি আমাকে বললেন, "তোমার হাতে মাত্র আধাঘন্টা সময় আছে। এর মধ্যেই সব কিছু গুছিয়ে নাও। আমার আহত হওয়ার খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এখনই এখান থেকে সরে যেতে হবে। আল্লাহ অন্তরে সাহস দিলেন। আধাঘন্টা সময়েই নামায, খাওয়াদাওয়া ও সামানাপত্র(যা খুব কম ও হালকা ছিল, যাতে সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়।) গুছিয়ে নিলাম। এসময় তিনি এক জিম্মাদার ভাইয়ের সাথে সামনের কাজের পরিকল্পনা করছিলেন। এই আধা ঘণ্টা সময়ে শয়তান আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মনে শুধু এই চিন্তা আসছিলো যে, যদি পরিস্থিতি আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেয়, তাহলে আমার কী হবে? কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন এবং আমার অন্তরকেও মযবুত করে দিয়েছিলেন।

পরে তিনি আমাকে বলেছেন - হামলার সময় তিনি ঐ গ্রুপে ছিলেন, যারা ক্যাম্পে প্রবেশ করে একটি চেকপোষ্ট দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাছেই একটি গ্রেনেড বিষ্ফোরিত হওয়ায় তিনি আহত হন এবং রক্ত বের হওয়া শুরু হয়। তিনি দ্রুতই সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন(কারণ রক্তক্ষরণ বেশি হলে পরে আর বের হতে পারতেন না)। মুজাহিদগণ প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেটে ক্যাম্পে এসেছিলেন, তাই সে পর্যন্ত হেটে যেতে হবে। অপরদিকে তাঁর রক্তক্ষরণও বেশি হতে লাগলো, তাই তিনি জামা খুলে শক্ত করে বেঁধে নিলেন। এভাবে খুব কষ্ট করে সেনাবাহিনীর চেকপোষ্টগুলো থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলেন। কিছুদিন পর তিনি আমাকে ঐ কাপড় এনে দেখিয়েছিলেন যা পুরোটাই রক্তে রঞ্জিত ছিলো। কেবল দু এক জায়গায় কাপড়ের আসল রং দেখা যাচ্ছিল।

হাসপাতালে গিয়ে সকল আহত সাথীর ব্যন্ডেজ করানোর পর নিজের ব্যন্ডেজ করালেন। (হে আল্লাহ! তুমি তাঁর খেদমত কবুল কর)। অল্প কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন (অথচ ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলো)। এ সময়েও লাগাতার বৈঠক চালু রেখেছিলেন। তারপর আহত পা নিয়েই লাঠিতে ভর করে ময়দানে চলে গেলেন। কারণ পরিস্থিতি অবসর ও বিশ্রামের সুযোগ দিচ্ছিলো না।

সেনা অভিযানের আশঙ্কায় এই এলাকা থেকে প্রায় সকল মুহাজির পরিবারকেই সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। শুধু আমি এবং আরেক শহীদ পরিবার বাকি ছিলাম। আসরের সময় আমাদের অস্থায়ী বাড়ির খুব কাছেই ড্রোন মিসাইলের বিকট আওয়াজ এসেছিল। পরের দিন তিনি এসে বললেন, "এই হামলায় আমার খুব কাছের একজন ভাই মাওলানা সাঈদুল্লাহ গুরুতর আহত হয়েছেন"। অবশ্য দুই সপ্তাহ পর (ক্ষতস্থানের ব্যথা-যন্ত্রনা ভোগ করে) শহীদ হয়ে গেছেন। (আল্লাহ তাকে কবুল করুন। আমীন)। এই হামলায় তার ভাইসহ আরো দুইজন সাথী শহীদ হয়েছেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর তিনি একদিন বললেন, তোমাদের দুই পরিবারেরও সফরের ফয়সালা হয়েছে। পরের দিন সম্ভবত শা'বান মাসের উনত্রিশ তারিখ ছিল, আমরা সফরের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে দাড়ানো অবস্থায় কয়েকটি নসিহত করে চলে গেলেন। আমার খুব খারাপ লাগছিলো। এই অবস্থায় প্রিয় স্বামীকে রেখে আমি কোথাও যেতে চাচ্ছিলাম না। আর হিজরত ও জিহাদের ভূমি থেকে কোথাও যেতে মন চাচ্ছিলো না। এখানে

শাহাদাত লাভের সম্ভাবনা খুবই দৃঢ় ছিল। সেনা অভিযানের এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলেরই শাহাদাতের খুব তামান্না ছিল। এখান থেকে আসলে কারোই যেতে মন চাচ্ছিল না। পুণরায় এখানে যে ফিরে আসা যাবে তেমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে গেলাম। এ অবস্থায় আমার জান্নাতের এই গুণটির কথা সর্বদা স্মরণে আসছিলো যে, জান্নাতবাসীদেরকে আপন জায়গা থেকে কখনো বের করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদের ঠিকানা বানিয়ে দিন, আমীন।

কিছুদিন পর যখন অবস্থা একটু ভালো হলো, তখন আমিসহ আরো কিছু মুজাহিদ পরিবারকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হলো। এর কিছুদিন পর আমরা প্রথমে মেহসুদ, তারপর উত্তর ওয়াজিরিস্তানে চলে গেলাম।

স্বভাবগতভাবেই তিনি দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। অধিকাংশ সময় এবিষয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করতেন। ভালো খাবারের প্রতি তার ছিল প্রচন্ড আগ্রহ, কিন্তু সর্বদা তা থেকে বেঁচে থাকতেন। আর আমাকেও সবসময় একথা বলতেন যে, "স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য সময়ে তুমি যে খাবার রান্না কর, আমি আসলে তাই রান্না করবে। অতিরিক্ত আয়োজন করবে না।"

তিনি কোথাও ভালো কিছু খেয়ে আসলে ঘরে এসে তা বলতেন। তখন আমি তাকে বলতাম, "আমাকে তো আপনার পছন্দের খাবার তৈরী করতে দেন না"। উত্তরে তিনি বলতেন, "আমি যে খাবারেরই প্রশংসা করব তাই তৈরী করার পিছনে লেগে যাবে? নিজের শক্তি, যোগ্যতা, সময় ও মেধা এর থেকে উত্তম কাজে অর্থাৎ ইলম অর্জনে ব্যয় কর"।

তিনি মেহমানের সেবা-যত্ন সাধ্য অনুযায়ী খুব ভালোভাবে করার চেষ্টা করতেন। একবার আমাদের ঘরে শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিব্বি রহ. এসেছিলেন। তিনি তার সাথে যুহদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছিলেন। এদিকে আমি মেহমানের জন্য কেক বানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি এসে নিয়ে গেলেন। শায়খ লিব্বি রহ. রসিকতা করে বলেছিলেন, فأين الزهد؟ (দুনিয়াত্যাগ কোথায় গেল?) তিনি হাঁসি দিয়ে বললেন, "এ তো মেহমানের সম্মানার্থে"।

তিনি নিজে কখনো অতিরিক্ত কাপড় রাখতেন না, আমাকেও রাখতে দিতেন না। বিবাহের পর থেকেই কয়েকমাস পরপর আমার সমস্ত সামানপত্রের হিসেব নিতেন এবং অতিরিক্ত জিনিস দান করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করতেন। তার তরবিয়তের বরকতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার বুঝে এসেছে যে, হিজরত ও জিহাদের ময়দানে যেহেতু সফর খুব বেশি করতে হয়, তাই সামানপত্র যত কম হবে, স্থানান্তর ও বহনকারী মুজাহিদ ভাইদের জন্য ততই সহজ হবে।

যুহদের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনয় ও নম্রতার গুণেও গুণান্বিত করেছিলেন। এমনিতেই কথা নিচু আওয়াজে বলতেন। কোন বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় আওয়াজ আরো নিচু হয়ে যেত। একবার আমাকে কোন একটি বিষয়ে একটি চিঠি লিখতে বললেন। আমি লিখে তাকে দেখালাম। তিনি কিছু শব্দ সংশোধন করে বললেন, "চিঠির ভাষা এমন হওয়া উচিৎ নয় যেন চিঠি পরে মনে হয় যে লেখক চিঠি লিখে পাঠকের উপর দয়া করেছেন, এক্ষেত্রেও বিনয় প্রকাশ করা উচিৎ।

আমার কথাবার্তার মাঝে অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোও তিনি সাথে সাথে সংশোধন করে দিতেন। একবার আমি কোন কথার প্রেক্ষিতে বলে ফেললাম, "আল্লাহ আপনাকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন"। তিনি সাথে সাথে আমাকে বললেন, "তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও"। আমি বললাম, "আমি তো এমনিই বললাম"। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা - তিনি বললেন, "তুমি তো আমাকে বদ-দোয়া দিয়েছ, কারণ আল্লাহ যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সে তো ছাড় পাবে না"।

আরেকটি ঘটনা – একবোন একবার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। বোন হজ্জের সফরে থাকাকালীন সময়ে একবার ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন স্বপ্নে দেখেন তাকে ফল খাওয়ানো হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তার কোন ক্ষুধা-পিপাসা বাকি ছিলো না। আমি এই ঘটনা তাকে শুনিয়ে বললাম, "আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাইয়েছেন"। তিনি বললেন, "না। বরং তার স্বপ্নে মনে হয়েছে তাকে জান্নাতের ফল খাওয়ানো হয়েছে"।

একবার কোন এক ব্যক্তি কিছু সচ্ছল মুজাহিদ পরিবারের ব্যাপারে আলোচনা করল। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "কখনও কারো ঘরের সামানপত্র, ভালো চলাফেরা, আলমারিতে রাখা অতিরিক্ত জিনিসপত্র তার তাকওয়ার মাপকাঠি বানাবে না। কারণ যে ব্যক্তি হিজরত করে এসেছে, সে অবশ্যই অনেক কিছু ছেড়ে এসেছে। তোমার কি

জানা আছে যে, এখন সে যেভাবে চলা-ফেরা করে, এর পূর্বে সে কেমনভাবে চলাফেরা করত? এবং কী পরিমাণ কুরবানি করে এখানে এসেছে? তাছাড়া নিজের সম্পদ নিজের জন্য খরচ করা তো হারাম নয়। তুমি তো এটাও জান না যে, তার সম্পদ জিহাদের কত কাজ উদ্ধার করে। সুতরাং কারো সম্পদ তার তাকওয়ার মাপকপঠি বানাবে না। নিজের জন্য তো মাপকাঠি বানাবেই না, অন্যের জন্যও এমনটা করবে না।

এমনিভাবে এক রমযানে আমরা একজনের বাসায় ছিলাম। পাশেই এক মারকাযে তিনি সাথীদের শরয়ী দাওরা করাচ্ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ইশা ও তারাবীহ পড়ে বাসায় আসতেন। একদিন ঐ ঘরের আপা বললেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পিয়াজ রসুনের ব্যবহার সম্পর্কে কোন একটি আদেশ করেছেন। আমি তাকে এই ঘটনা উল্লেখ করে বললাম, "আমাদেরও তো এই আদেশ মানা উচিত"। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "প্রথমত যে স্বপ্নে দেখেছে তার নিশ্চিত হতে হবে, যাকে সে দেখেছে তিনি আসলেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি না? নাকি তার ধারণা হয়েছে মাত্র (কারণ শয়তান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না, কিন্তু অন্যের আকৃতি ধারণ করে রাসুল দাবী করতে পারে)। যদি সে সত্যিই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে থাকে এবং তিনি কোন আদেশ নিষেধ করেন তাহলে ঐ আদেশ-নিষেধ শরীয়তের আলোকে যাচাই করতে হবে। যদি শরীয়তের ভিতরে থাকে তাহলে আরো গুরুত্ব সহকারে আমল করা শুরু করতে হবে। যেমন: দান-সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। আর যদি না থাকে, তাহলে আমল করা যাবে না। কারণ আল্লাহ শরীয়ত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। কারো ব্যক্তিগত স্বপ্নের উপর নির্ভরশীল করে রাখেননি। বরং আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শরীয়ত ও কুরআন-সুন্নাহকে কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। এখন আর শরীয়তে নতুন কিছু বৃদ্ধি পাবে না"।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা যেহেতু চলে এলো, তাই প্রাসঙ্গিক আরেকটি বিষয় উল্লেখ করছি। একবার তিনি বললেন, "আমাদের উস্তাদ বলেছেন - তোমরা পরীক্ষার খাতায়ও (তখন তো সময় সীমাবদ্ধ থাকে) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে দুরুদ শরীফ পূর্ণ লিখবে, সংক্ষেপে লিখবে না (কিছু বিষয় তো এমন আছে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বার বার আসে)। পূর্ণ দরুদ শরীফ লিখলে, এর দ্বারা সময়ে অনেক বরকত হবে ইনশা আল্লাহ।

তার আরেকটি গুণ আমি সর্বদা দেখেছি - সেটা হলো 'অন্তরের পরিশুদ্ধতা'। জিম্মাদারী পালনে তিনি ছিলেন তৎপর। মাসায়েল ও পেরেশানীর ক্ষেত্রে কখনও কোন সাথীর উপর অভিযোগ থাকলে হিকমতের সাথে তা প্রকাশ করতেন। এরফলে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত ঐ সাথী নেতিবাচক চিন্তা মন থেকে সরিয়ে কোন কাজে লেগে গেছে। কিছুদিন পরেই তিনি ঐ সাথীর এমন প্রশংসা করতেন যে, আমি হয়রান হয়ে যেতাম। এমনিতে তিনি সাথীদেরকে খুব মুহাব্বত করতেন। অধিকাংশ সময় সাথীদের কল্যাণকর বিষয়গুলো আলোচনা করতেন।

শুরু থেকেই আমি দেখেছি - তিনি মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক ঐক্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অনেক চিন্তা-ফিকির করতেন। তার এই চেষ্টা সম্পর্কে আমিও কিছু বিষয় জানতাম। তিনি একবার তার এক চিঠিতে শায়খ মুস্তফা আবু ইয়াজিদ রহ. এর একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ নিজে তাকে বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম তুমি আমার কাছে বসে মুজাহিদীনের মাঝে পারস্পারিক ঐক্য ও সুসম্পর্ক কম হওয়ার অভিযোগ করছ। এবং এ ব্যাপারে কথা বলতে বলতে কাঁদছ"। এ কথা বলে শায়খ মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমার চিন্তা-ফিকির ও চেষ্টাকে কবুল করুন"।

মুজাহিদীনের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে ঐক্য গঠন করা এক দুঃসাধ্য ও কঠিন বিষয় ছিলো। এই ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের কাছ থেকেই পরিপূর্ণ ইখলাছ, ত্যাগ ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার গুণ অত্যাবশ্যক ছিল। যখন এই চেষ্টা আলকায়দা উপমহাদেশ শাখা গঠন পর্যন্ত পৌছলো, তখন তার ইখলাছ, কুরবনী ও অন্যকে প্রাধান্য দান দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিঃসন্দেহে তার জন্য এ বিষয়গুলো সহজ ছিলো না। এসময়ে আমি তার মাঝে যে খুশি রাখা ও নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার গুণাগুণ দেখেছি, নিঃসন্দেহে তা তার ইখলাছ ও স্বচ্ছ হৃদয়েরই প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা তার ও সকল মুজাহিদ ভাইদের চেষ্টাকে কবুল করুন এবং জামা'আতের প্রতিষ্ঠা তার জন্য ও উম্মতের জন্য উপকারী করুন। আমীন।

তিনি ছিলেন এ ধরায় তাওহীদের সাক্ষী!

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগল। কখনো পরিস্থিতি ভালো, কখনো খারাপ। অবস্থা বেশি খারাপ হলে মুজাহিদ পরিবারগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হতো। অবস্থা ভালো হলে আবার তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হতো। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুহাজির মহিলাদের মনের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা এখানে থেকে শহিদ হয়ে যাব, তারপরও অন্য কোথাও যাব না।

কিছু কারণে ২০১৪ সালে একবার আমার পাকিস্তান আসতে হয়েছিলো। নিরাপত্তার দিক খেয়াল করে আমার স্বামী আমাকে যেতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তারপর জুন মাসে দশদিনের জন্য পাঠালেন। আমি পাকিস্তানেই থাকাকালীন সময়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়াজিরিস্তানে হামলা শুরু করে দিল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম এই ভেবে যে, এখন কিভাবে ফিরে যাব?

দশদিনের স্থানে বিশদিন পর আমার ডাক আসলো। আমি সেখান থেকে ওয়ানা চলে আসলাম। কিছু দিন ওয়ানায় অবস্থান করে শাবিলে চলে আসি। আমার স্বামীর কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছিলাম না। কিছুদিন পর একটি চিঠি আসলো - তাতে তিনি আমার ফিরে আসায় খুশি প্রকাশ করেছেন। সাথে এটাও লিখেছেন যে, এই মুহূর্তে দেখা করাটা কঠিন মনে হচ্ছে।

এদিকে রমযান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। দিনটি সম্ভবত সাত তারিখ ছিলো। আমরা অনেক মুহাজিরা মহিলা বাচ্চাদেরসহ এক ঘরের মধ্যে ছিলাম। এসময় হঠাৎ আমার প্রিয় দুইজন বোন প্রতিযোগীতার সাথে দৌড়ে আমার দিকে আসলো। তারপর বলতে লাগল, আপা! ভাইজান তো এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। মুজাহিদগন একজনের খুশিতে সবাই খুশি হন ,একজনের দুঃখে সবাই দুঃখী হন। ঈমানের সম্পর্ক অনেক সময় রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর হয়। তিনি এসে বললেন, আগামী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

যেদিন তিনি আসলেন, সেদিন রাতে সেহরীতে উঠার জন্য আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। হঠাৎ বোম্বিংয়ের আওয়াজে প্রথমে তার তারপর আমার ঘুম ভাঙলো। তারপরই এলার্ম বেজে উঠলো। অর্থাৎ ঠিক দুইটার সময় হামলা হয়েছে। তিনি বললেন - পাকিস্তানী জেট বিমান বোম্বিং করছে। সাথে সাথে মহিলাদেরকে বাচ্চাসহ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বললেন। ভাইদের বললেন ঘর থেকে বের হয়ে গাছগাছালির নিচে আশ্রয় নিতে। নিচের দুইটি কামরাতে সমস্ত মহিলা ও বাচ্চাদের জায়গা হয়ে গিয়েছিল। আর একটি গর্তের মত জায়গা ছিলো, সেখানে আমরা দুইজন জায়গা করে নিলাম।

তিনি সবাইকে কিছু জরুরী নির্দেশনা দিলেন। তিনি বললেন, "আমরা সবাই আজ থেকে সেহরী নিচে খাবো(প্রয়োজনে রাতেই খাবার তৈরী করে সকালে ঠান্ডা খাবে)। তারপর ফজর পড়ে উপড়ে যাব। আবার ইফতার শেষ করেই নিচে এসে মাগরীব ও ইশা আদায় করব"। কিছু বয়স্ক মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য এই নিয়ম অনুযায়ী চলা খুবই কষ্টকর হয়ে গেলো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সবাই এই উসূল অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরূপে আ'মল করেছেন। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

সকালে জানতে পারলাম যে, পাক-বাহিনী সাত জায়গায় বোম্বিং করেছে। শহীদ ও আহতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল কম, নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল বেশী। ধংসস্তুপ সরানোর দায়িত্বে থাকা ভাইরা ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ করছিলেন।এসময় একজায়গা থেকে খুব সুঘ্রাণ আসতে লাগলো। ভাইয়েরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ধংসস্তুপ সরানো শুরু করলেন। এই সুঘ্রাণ তো শহীদদের বিশেষ বৈশিষ্ট ছাড়া আর কিছুই না!! তারা সেখানে একজন মহিলার লাশ পেলেন। যিনি পোল্যান্ডের অধীবাসী নওমুসলিম ছিলেন। তিনি কুরআন শরীফ মুখস্ত করছিলেন, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা বাকি ছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। (نحسبها كذالك অর্থ:এমনটাই আমাদের বিশ্বাস)

এমনিভাবে আমাদের আরেকজন প্রিয় ভাই স্ত্রী ও দুই ছোট মেয়ে সহ শহিদ হন। এক মেয়ের বয়স ছিল সাত বছর, আরেকজনের প্রায় নয় বছর। ছোট মেয়েটিকে তার পিতা কুরআনের শেষ তিন পারা মুখস্ত করিয়েছিলেন এবং লেখাও শিখিয়েছিলেন। মেয়েটি পড়া লেখায় এত মজবুত ছিল যে, লেখা বা পড়াতে কোন ভুল হত না। এছাড়া আরো কিছু মুজাহিদও শহীদ এবং আহত হয়েছেন।

এই হামলায় আল্লাহর রহমতের কিছুটা বহিঃপ্রকাশ এভাবে হয়েছে যে, হামলায় ধ্বসে যাওয়া ঘরগুলোর একটি ঘরে মোটা অংকের বাইতুলমালের আমানত রাখা ছিলো। দায়িত্বশীল ভাইয়েরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ যাদের কাছে আমানত ছিলো তারা তো শহিদ হয়ে গেছেন। এখন এই ধ্বংসস্তুপ থেকে বায়তুল মাল কিভাবে বের করবে? কোথায় তালাশ করবে?

আমানতের মাল তালাশের জিম্মাদার মুজাহিদ ভাই সামান-পত্র বের করছিলেন, আর প্রত্যেকটি জিনিস ভালোভাবে দেখছিলেন। কয়েকঘন্টা চেষ্টার পর ক্লান্ত হয়ে ঐ জায়গায়ই বসে পড়লেন।

অপরদিকে উদ্ধারকর্মী ভাইয়েরা তার থেকে কিছু দুরে মাটিসহ আটার একটি বস্তা এবং আরো কিছু সামানা বের করে রাখলেন। জিম্মাদার ভাই নিরাশ হয়ে সেই সামান-পত্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এর মাঝে আমানতের মাল পাওয়া যাবেনা। এরপর তিনি ঐ সামান খুলতে গেলেন। যেই প্রথম থলে খুললেন, তাতেই ঐ আমানত পেয়ে গেলেন। এটা আল্লাহর এক খাছ রহমত ছিলো, নতুবা এই মাল বের করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বাইতুল মালের ব্যাপারে একভাই একবার বলছিলেন, নিজের মালের তুলনায় আমানতের মালের প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হয়। কারণ এটা গোটা উম্মতের আমানত। সুতরাং তা হেফাজতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও দোয়া করে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। আর বেশি বেশি এই দোয়া করা, 'হে আল্লাহ! এই মাল আপনার, আপনিই তা হেফাযত করুন। আল্লাহ থেকে বড় হেফাযতকারী আর কেহ নেই।

এই হামলার পূর্বে শাবিল এলাকা তুলনামূলক কিছুটা নিরাপদ ছিলো। কিন্তু হামলার পর সিদ্ধান্ত হলো মুজাহিদ পরিবারগুলোকে আরো দূরবর্তী এলাকায় পাঠানো হবে। আমাদের জন্য এটি খুবই কষ্টদায়ক সংবাদ ছিলো।

সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলো। আমি গিয়ে সবাইকে বললাম আমাদের সবার চলে যাওয়ার ফয়সালা হয়েছে। একথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ ছিলো। তারপর সবাই হাসতে লাগলো। তখন আল্লাহর রহমত আমাদের উপর নাযিল হচ্ছিলো, তিনিই আমাদের অন্তরগুলোকে প্রশান্ত রেখেছিলেন। আমাদের হাসি শুনে অন্য কামরা থেকে এক বোন এসে বলল, "হাসার কারণ কি"? আমরা কারণ বললাম। সে বলল, "এটা কি হাসির খবর নাকি কান্নার খবর"? আমরা বললাম, "আল্লাহ আমাদেরকে বোমা বর্ষণের মাঝেও যখন হাসাচ্ছেন তখন আমরা কেন হাসব না?!!!"

এবার আমাদের প্রসঙ্গে চলে আসি। তিনি যখন আমাকে বললেন, তোমাদের সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে হবে - তখন থেকে আমার চোখের অশ্রু থামছিল না। তিনি নীরবে বসে আমাকে দেখছিলেন। এশা ও তারাবীহ পড়ে যখন দোয়া করতে বসলাম, তখন আবার অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু হলো। যখন কোনভাবেই আমার চোখের পানি থামছিল না, তখন তিনি আমাকে বললেন, "এবার থামো"। আমি অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে তার কাছে এসে বসলাম। তিনি বললেন, "তালেবানদের ইমারতে ইসলামিয়া হাতছাড়া হওয়ার পর শায়খ উসামা রহ. নিজের সাথীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় থামলেন। সেখান থেকে শায়খ উসামা রহ. নিজের রাহবার এবং আরো কিছু সাথী নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। পৃথক হওয়া দলে শায়খ উসামা রহ. এর একজন ছেলেও ছিল। শায়খ রহ. তার ছেলেকে নিয়ে একপাশে চলে গেলেন। পিতা-পুত্রের এই সাক্ষাৎ খুব আবেগঘন ছিল। কারণ কারোই জানা ছিলো না পরস্পরে আর দেখা হবে কি না!! শায়খ তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার সাথে ওয়াদা কর - কখনো জিহাদ পরিত্যাগ করবে না!!"। তিনি (আমার স্বামী) এতটুকু বলেই চুপ হয়ে গেলেন। আমি তার নসিহত বুঝতে পারলাম এবং আমার থেমে যাওয়া অশ্রু আবার প্রবাহিত হতে লাগলো।

সেহরির পর সবাই ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে পালাক্রমে অজু করে নিল। এখন আমাদের পালা। আমরা অজুর উদ্দেশ্যে বের হলাম। মাত্র দুই তিন সিড়ি উঠেছি, এমন সময় জেট বিমানের আওয়াজ আসতে লাগলো। আমরা সাথে সাথে নিচে নেমে গেলাম এবং সিড়ির গোড়ায় দাড়িয়ে গেলাম। তখন আমি বললাম "হে আল্লাহ! আমাদেরকে সবধরনের পরীক্ষা থেকে হেফাযত করুন। বিশেষ করে গ্রেফতারী, অক্ষম হওয়া ও মাজুর হওয়া থেকে হেফাজত করুন এবং পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব করুন"।

একথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে রসিকতা করে বললেন, বেগম সাহেবা! শাহাদাত তো সর্বদা পরিপূর্ণই হয়। আধা, পৌনে কিভাবে হয়"? আমি একটু ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, "আমার উদ্দেশ্য হলো দেহের কোন(عضو) 'অঙ্গ' শহিদ না হোক। বরং একসাথে পরিপূর্ণ শাহাদাত নছিব হোক"। একথা শুনে তিনি হেসে বললেন, "বেগম সাহেবা! শব্দটি عضو (আইন ও দোয়া হরফে পেশ দিয়ে) উদু উচ্চারণ হবেনা বরং দোয়া হরফে যজম দিয়ে "উদউ" উচ্চারণ হবে। পরিস্থিতির কারণ তখন আমার উচ্চারণে ভুল হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই পরিস্থিতিতেও তিনি আমার দোয়া শুনেছেন আর শব্দের ভুল শুধরিয়ে দিচ্ছেন। যাইহোক পরবর্তীতে প্রমানিত হয়েছিল যে, মানুষের কোন দোয়াই বৃথা যায় না। তাই দোয়ার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা উচিৎ নয়।

শাবিলে আমরা যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে উত্তর দিক থেকে মুজাহিদ পরিবারগুলো এসে অবস্থান করত। এরপর সামনের মনযিলে চলে যেত। আমিও আমার পালার অপেক্ষা করছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম আমার সফরের সময় আমার স্বামী আমার সাথে থাকবেন। কিন্তু অতি দ্রুতই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

একদিন আমরা উভয়ে দিনের বেলাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলাম। কারণ উপরে কোন কামরা খালি ছিলো না। তিনি বললেন, "আমি একটু ঘুমাব। আমি বললাম, "না ঘুমানো যাবেনা। আজ আমার সাথে কথা-বার্তা বলবেন"। তিনি আমার কথা শুনলেন। সাধারণত তিনি বেশী কথা বলতেন না। বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমি এবিষয়টা নিয়ে অনেক ঝগড়া করতাম। আমার অভিযোগ ছিল সাথীদের সাথে এত কথা বলেন অথচ আমার সাথে বলেন না। তিনি বলতেন, "সাথীরা তো কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তুমিও দ্বীন, জিহাদ বা সমসাময়িক কোন আলোচনা শুরু কর, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করব। কিন্তু এমনিতেই আমার কথা আসে না"। তারপর থেকে আমাদের কথা-বার্তা জিহাদ ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা।

যাই হোক আন্ডারগ্রাউন্ডে বসে আমি আমার মানসিক পেরেশানীর কথা জানালাম। সংবাদপত্র ইত্যাদিতে যে খবরাখবর পড়েছিলাম তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে সবকিছু বিস্তারিত বললেন।

আইএসের ব্যাপারে আমার মন খুব ভারাক্রান্ত ছিলো। কিছু মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের সাথে যোগ দিচ্ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একজন মানুষ শত কুরবনী করে আল্লাহর রাস্তায় এসে গোমরাহ হয়ে যাবে? এটা কিভাবে এবং কেন হয়? তিনি বললেন, *"যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘর থেকে বের হয়, তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরেই নিজেকে অর্পণ করে, তাকে আল্লাহ কখনো গোমরাহ করেন না। কারণ আল্লাহ কারো উপর যুলুম করেন না। কিন্তু মানুষের অন্তরে যদি কোন ত্রুটি থাকে অথবা যদি তার আমল-আখলাকে শরীয়ত বিরোধী কোন দোষ থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে সংশোধনের সুযোগ দেন। যারা ভালো তবিয়তের হয় তারা দ্রুত বা সময়সাপেক্ষে সংশোধন হয়ে যায়। আর কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর দেয়া সুযোগকে গ্রহণ করে না। নিজের খারাপ স্বভাবের উপর অটল থাকে। সময়ের সাথে সাথে তার এই খারাপ স্বভাব বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত খারাবির তীব্রতা প্রকাশ পায়। এরাই পরবর্তীতে গোমরাহ হয়ে যায়"।*

এধরনের আরো কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার পর আমি তাকে বললাম, "এতদিন তো আপনি আমাকে আঙ্গুল ধরে ধরে এই রাস্তায় চালিয়েছেন, প্রত্যেকটি বিষয় বুঝিয়েছেন। আপনি যদি শহীদ হয়ে যান, তাহলে আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় প্রকাশিত এই ফেতনায় কে রাস্তা দেখাবে"? তিনি বললেন, "আল্লাহ তো আছেন। তিনি সবাইকে হেদায়াত দান করেন। তিনিই রাস্তা দেখাবেন"। আমি বললাম, "আল্লাহর সুন্নত হলো দুনিয়াতে মানুষের সংশোধন অন্য কোন মানুষের মাধ্যমে করেন। (আল্লাহ সমস্ত মাধ্যমের স্রষ্টা, তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন)। আল্লাহ আমার সংশোধনের জন্য আপনাকে নির্ধারণ করেছেন"। তিনি বললেন, "অনেক বিষয়ই তো আমি তোমাকে সাথে সাথে রেখে বুঝিয়েছি। আমার কথাগুলো স্মরণ রাখবে। শায়েখদের বয়ান শুনতে থাকবে। কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে"। এরপর সবসময় উনি যে কথাটা বলেন সেটা আবারও বললেন, "আমার পর আবার বিবাহ করবে, কোন মুজাহিদের দ্বিতীয়, তৃতীয় নম্বর স্ত্রী হয়ে থাকাকে সহ্য করবে, কিন্তু একা থাকবে না"। শেষে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন "যদি ফেতনা থেকে বাঁচার কোনও উপায় না পাও তাহলে ইয়েমেনে হিজরত করবে। কারণ (হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী) ইয়েমেনে কল্যাণ রয়েছে"। ঐদিন আমাদের আলোচনা এপর্যন্তই সমাপ্ত হয়েছিলো।

আমার রওনা করার পূর্বেই তার রওনা করার আদেশ হল। আমরা শুধুমাত্র ছয়দিন একত্রে ছিলাম। এই ছয়দিনে তিনি বারবার আমাকে একথা বলছিলেন, "আমার অমুক কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখ, পরে আমি থাকব কি না জানিনা। অথবা আমার অমুক কথা ভালোভাবে বুঝে নাও, পরে আমি নাও থাকতে পারি। অমুক জিনিসটা তোমার কাছে হেফাযত করে রাখ, পরে আমি থাকি কি থাকি না জানা নেই"।

বলতে বলতেই সফরের সময় হয়ে গেলো। তিনি প্রস্তুতি নিলেন। পোশাক পড়ে ক্লাসিনকোভ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন, আমিও তাকে দেখছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেঁসে বললেন, "আমাকে ভালোভাবে দেখে নাও, পরে হয়ত নাও থাকতে পারি"। তারপর তিনি চলে গেলেন।

কিছুদিন পর আমিও ওয়ানায় চলে গেলাম। সেখানে এক আনসারের ঘরে আমার সাথে অপর এক বোনও ছিলো। একদিন খবর পেলাম উত্তরাঞ্চলে বোমা হামলা হয়েছে। দুইজন জিম্মাদার ও চারজন সাথী শহিদ হয়েছেন। সংবাদদাতা মুজাহিদ ভাই যখন পর্দার অপর পাশ থেকে এই খবর দিলেন, তখন আমরা দুইবোন একে অপরের দিকে তাকালাম। মুজাহিদ ভাই একথা বলে চলে গেলেন যে, "যদি বিস্তারিত সংবাদ জানতে পারি, তাহলে জানাবো"। আমরা চুপ করে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করলাম, মনের কি অবস্থা? (কারণ আমাদের ধারণা ছিলো উভয়ের স্বামীই শহিদ হয়ে গেছে) দু'জনেরই উত্তর ছিলো - মন প্রশান্ত আছে। যদি কিছু না হয়ে থাকে তাহলে তো এমনিতেই প্রশান্ত। আর যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি তো আছেই। কিছুদিন ওখানে থাকার পর রমজানের শেষ দশকে আমি পাকিস্তান চলে আসি।

পাকিস্তান আসার পরও আমার স্বামীর সাথে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। অক্টোবর মাসে কুরবানী ঈদের দুইদিন আগে তার একটি অডিও বার্তা আসল। তাতে তিনি তার খবরাখবর জানানো ছাড়াও আমার অনুরোধে কিছু নসিহত করেছিলেন। আমি তার নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

"পরীক্ষার এই কঠিন মুহুর্তে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর সুধারণা বজায় রাখবে। প্রত্যেকে নিয়মিত নিজের আমলের হিসাব নিবে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতার হিসাব নিবে। দ্বীনের উপর অবিচলতা, জিহাদের সাথে সম্পৃক্ততা, এবং নিজ দেশ ও সারা দুনিয়ায় শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জযবা ঠিক রাখবে। নিজ জাতীকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসার জযবা, এবং এর জন্য কুরবানী পেশ করার জযবা যদি হ্রাস না পায় তাহলে সে সফল। আর এই ধরণের সফলতাই হল আসল সফলতা"

"যেখানেই থাকবে নিজেকে বড় মনে করে নয় বরং বিনয়ের সাথে থাকবে। আশপাশের মানুষের মাঝে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। খারাপ কাজে বাঁধা দিবে। এ কাজগুলো করতে গেলে কিছু না কিছু কষ্ট করতেই হয়। অনেক সময় মানুষের কটু কথাও শুনতে হয়। কিন্তু এজন্য সবকিছু ছেড়ে বসে থাকা যাবে না। মোটকথা মনে করতে হবে আল্লাহ আমাদের উপর এই জিম্মাদারী দিয়ে রেখেছেন।

"যদি আমি শহিদ হয়ে যাই তাহলে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে। জানি না জীবনের আর কতদিন বাকি আছে। আল্লাহর কাছে واخلف لي خيرا منه (আল্লাহ! তুমি আমাকে তার থেকে উত্তম প্রতিনিধি দান কর) বলে দোয়া করতে থাকবে। আল্লাহর ভান্ডারে কোন কিছুরই কমতি নেই। জান্নাতের দিকে প্রত্যেককে একাই সফর করতে হবে। আর প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে একা উপস্থিত হবে।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। সূরা মারঈয়াম - ১৯:৯৫

জযবা-উৎসাহ সবই আপন জায়গায় ঠিক থাকবে, বাকি সবার আগে এবিষয়টি চিন্তা করবে যে, দ্বীনের জন্য আমার কোনটা করা উত্তম হবে? আখেরাতের জন্য আমার কী করা উত্তম হবে? একজন মহিলা কি কোন দ্বীনদার, অথবা কোন মুজাহিদ, কিংবা কোন নেককার ব্যক্তি ব্যতিত আখেরাতের পথে চলতে পারবে? যদি না পারে তাহলে এটা আল্লাহর রহমত যে, আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের জন্য এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা আল্লাহর এই নেয়ামত দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করবে।

"পরীক্ষার এই স্তরগুলোতে দুর্বলতার কথা যেই বলবে, এর দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হবে না, এবং অন্যকেও প্রভাবিত হতে দিবেনা। বরং বুঝাবে যে, এই সমস্ত 'জ্ঞানের' কথা ঐসময় কেন বুঝে আসেনি যখন কুফরের মাথার উপর এবং পাকিস্তানী হুকুমতের উপর ধামাধাম হাতুড়ি পড়ছিলো? আমরা এখন একটু দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমাদের উপর কিছু আঘাত এসেছে, এটা ছাড়া তখন আর এখনের মাঝে আর কী পার্থক্য আছে? অবস্থা কঠিন হওয়ার কারণে সঠিক অবস্থান থেকে সরে যাওয়া, ওয়াজিব জিহাদ থেকে পিছু হটা, এটা তো মুমিনের শান নয়!!

এটি সাধারণ কোন বিষয় নয়, এটা আল্লাহর সাথে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের বিষয়। আমাদের জন্য এ রাস্তা থেকে সরে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। এগুলি তো আমাদেরকে ধোকা দিতে পারেনা। আল্লাহ আমাদেরকে এই পথে দৃঢ়তা দান করুন। আমিন। এই 'জ্ঞানের'কথা বললে, আগেই বলার দরকার ছিল। এই জিহাদের ব্যাপারে কোন সংশয় থাকলে আগেই প্রশ্ন উত্থাপন করে জেনে নেওয়ার দরকার ছিলো, যখন আমাদের শক্তি ছিলো। এখন দুর্বলতার সময় এবিষয়গুলি উত্থাপন উচিত নয়। দুর্বলতার সময় শক্ত হয়ে স্থির থাকো, আর আল্লাহর সাহয্যের অপেক্ষা করতে থাকো। ইনশা'আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী"।

এরপর আরো দুই মাস পার হয়ে গেলো কিন্তু তার কোন খোঁজ-খবর আমি পাইনি। আমি দোয়া করছিলাম আর তাঁর খোজ-খবরের অপেক্ষা করছিলাম। ডিসেম্বর মাসে মিডিয়ায় তার শাহাদাতের অস্পষ্ট সংবাদ প্রচারিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে দৃঢ়তা দান করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমার স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হলো। আমি অস্থায়ীভাবে এক আনসারীর বাড়িতে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি ভালো আছেন। মিডিয়ার প্রচারিত সংবাদ সঠিক ছিলনা। এরপর তাঁর কিছুদিন পূর্বের লেখা একটি চিঠি আমি পেলাম। তার কিছুদিন পর আবার আমি অন্য এক আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তরিত হলাম।

নতুন জায়গায় আমি একদম একা ছিলাম। একটি বড় বাড়ির দোতলা একদম খালি ছিলো, আমি সেখানে থাকতাম। বাড়ির লোকজন নিচতলায় থাকতো। আমি সবসময় উপরেই থাকতাম। তবে রাতের খাবার সাধারণত নিচে এসে আনসারী মহিলার সাথে খেতাম। তারপর আবার উপরে চলে আসতাম। এই একাকিত্বের মধ্যে আল্লাহ আমাকে স্থির রেখেছেন। আমার স্বামী আমাকে তাফসীর পড়তে বলতেন, কিন্তু তাফসীরের দীর্ঘ আলোচনা পড়তে আমার সাহস হতো না। একবার বলেছিলেন, "'তাফসীরে সা'দী' পড়। এটি সংক্ষিপ্ত এবং ব্যক্তিগত সংশোধনের জন্য অনেক উপকারী হবে ইনশা'আল্লাহ। আসল ফায়দাতো মূল আরবী পড়ায়, কিন্তু তুমি উর্দু তরজমাটাই পড়"।

তিনি নিজেও কিছুদিন পূর্বে এই কিতাব পূর্ণ অধ্যয়ন করেছেন। আমি তার এই নসিহতের উপর পুরোপুরি আমল করতে পারিনি। এখন এই একাকিত্বের সময় তাফসির অধ্যয়ন শুরু করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাফসীরের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দান করেছেন। আমিও কিতাবটি অনেক উপকারী পেয়েছি। একাকিত্ব ও পেরেশানীর এই কঠিন মূহুর্তে আল্লাহ আমাকে সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা বুঝার তাওফীক দান করেছেন। উহুদ যুদ্ধের আলোচনা, তাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতি পরীক্ষা এবং তা থেকে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ আমার হিম্মত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তাওফীক দিয়েছেন বিধায় বুঝার জন্য অন্তর এবং জেহেনও খুলতে শুরু করেছিল।

আমি সবধরণের যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সংবাদমাধ্যমে তো বিশ্বের খবরাখবর পাচ্ছিলাম, কিন্তু স্বামী ও পরিবারের কোন সংবাদ আমার কাছে ছিলো না। তার শাহাদাতের খবরটিও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

ঐ সময়েই আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে শাইখ আয়মান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহকে দেখলাম, বাহ্যত ঐ স্বপ্নে কোন আওয়াজ, কথা বা শাহাদাতের কোন ইঙ্গিত ছিলো না। (বাকি আমি কিছুই বুঝতে পারছিলামনা)। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই আমার মনে হচ্ছিল যে, এটা তার শাহাদাতের ব্যাপারে স্বপ্ন। এর পূর্বে অক্টোবর মাসে যখন তার অডিও বার্তা পেয়েছিলাম, তখন একদিন স্বপ্নে দেখি যে, তার শহীদ ভাই তাকে নেয়ার জন্য এসেছে। তখনও স্বপ্নের মধ্যেই মনে হয়েছিলো, এটি তার শাহাদাতের ব্যাপারে স্বপ্ন। এই দুই স্বপ্ন দেখার পরেও আল্লাহ আমার অন্তরকে স্থির ও প্রশান্ত রেখেছেন।

সময়টা মার্চের একুশ তারিখ ছিলো। আমার শ্বশুর আমার সাথে দেখা করতে আসলেন। আমি ধারণা করলাম তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছেন। সালামের পরই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বুজি! ভালো আছেন তো"? তিনি ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আমার সাথে এদিক সেদিকের কথা বলতে লাগলেন। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বুজি! সবার খবর ভালো তো"? তিনি এবারও ইতিবাচক উত্তর দিলেন এবং অন্যান্য কথা বলতে থাকলেন। এরপর তৃতীয় বার আমার প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি করলাম, তখন তিনি বললেন, "বেটি! সালমান তো শহীদ হয়ে গেছে"। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয় ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম। এরপর বললাম, "কবে"? তিনি বললেন, "জানুয়ারিতে"। আমি বললাম, "নিশ্চিত"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। এই নাও তার লেখা চিঠি।

তারপর আমাকে কিছু চিঠি দিলেন"। চিঠির মাঝে সান্ত্বনামূলক কথার সাথে তার একটি ওছিয়তও ছিলো। আল্লাহ আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দিলেন। আমি ওসিয়তনামাটা অক্ষরে অক্ষরে পড়ে শ্বশুরকে শুনালাম।

রাতে ওসিয়তনামাটা কয়েকবার পড়ার পর ঘুমিয়ে পরলাম। কিন্তু একটু পরেই ঘুম ভেঙে গেলো। মন এতটাই অস্থির ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আর কোনদিন মন শান্ত হবে না। তখন আমার ড. আরশাদ ওহিদ রহ. এর স্ত্রীর কথা মনে পড়ছিলো। যখন ড. সাহেবের শাহাদাতের পর আমি তার কাছে গেলাম, তখন তিনি বলেছিলেন - মনে হচ্ছে কে যেন বাস্তবেই আমার কলিজার একটি টুকরা টেনে বের করে নিয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমি দোয়া করেছি, আল্লাহ! আপনি আমার কষ্টের প্রতিটা মুহূর্তের জন্য প্রতিদান দান করুন"। আমার মনের অস্থিরতা এতটাই বেশি ছিলো যে, মনে হচ্ছিলো আমার কলিজা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। শারিরীকভাবেও কষ্ট অনুভব করছিলাম। এই কঠিন মসিবতে আমার রব ব্যতীত নির্ভরতার আর কেউ ছিলনা। তাই আমি রাতের এই একাকিত্বের মূহুর্তে আল্লাহকেই স্মরণ করতে লাগলাম।

আল্লাহর রহমত, দয়া ও তাঁর ভলোবাসার উপর আমাদের জীবন কুরবান হোক। তিনিই তাঁর বান্দাকে ভালো কাজের তাওফীক দেন। এরপর যখন বান্দা দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ নিজে অগ্রসর হয়ে তার হাত ধরেন। তাকে আশ্রয় দান করেন, সান্তনা দান করেন। তার মন ভালো করেন। হিম্মত হারাতে দেন না। মন শক্তিশালি করেন, পথ চলা সহজ করেন। শেষ পর্যন্ত সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। তখন আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। পরীক্ষার ভাটায় ফেলে পাকা বানান। তবে আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলে সাথে সাথে এমন প্রশান্তি দান করেন যে, পরীক্ষার কোন কষ্টই অনুভব হয় না। সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

শাহাদাতের খবর আসার তৃতীয় দিন। আমি বাহ্যিকভাবে স্বাভাবিক ছিলাম। কিন্তু মন খুবই অস্থির ছিলো। লাগাতার দোয়া কালাম পড়ছিলাম। আমি কাপড় ইস্ত্রি করছিলাম, আর আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। কেবল একটি চিন্তাই সকল চিন্তার উপর প্রবল হচ্ছিল যে, আমার স্বামী সত্যি কী শহীদ হয়েছেন? আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না।

বিভিন্ন যিকির আযকার পড়তে পড়তে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ পড়ছিলাম। হঠাৎ দোয়ার অর্থের দিকে খেয়াল গেলো। আমি কোন দোয়া পড়ছি? আমি কাকে ডাকছি? আমি তো বলছি حَسْبُنَا اللهُ; আল্লা্হই আমার জন্য যথেষ্ট। তাহলে আমার এত চিন্তা করার প্রয়োজন কী? আমার অন্তর অস্থির কেন? আমার আল্লাহ তো আছেন। যিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা বিদ্যমান, চিরকাল আছেন, চিরকাল থাকবেন। তারপর আমার ঐসমস্ত আয়াত মনে পড়ল, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে পড়েছিলেন।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মদ একজন রাসুল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধ হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৪৪)

একথাও মনে পড়ল যে, শহীদগণ তো জীবিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হন। আল্লহর নেয়ামতে খুশি প্রকাশ করেন। তাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশান্ত করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এর পর আর কখনো মন অস্থির হয়নি।

আমার অন্তরে বারবার এই খেয়াল আসছিলো, না জানি তার জীবনের শেষ দিন কোথায় কিভাবে, কোন অবস্থায় কেটেছে? কার কার কথা মনে পড়েছে? এধরণের অনেক কথা মনে ঘুরপাক খচ্ছিলো। সমবেদনা জানানোর জন্য আগত মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন "নিশ্চয়ই তিনি আপানার নামে কোন চিঠি লিখে রাখবেন"। আমি তার কথা শুনে হাঁসলাম আর ভাবলাম, যেখানে তার শাহাদাতের খবরই পেলাম প্রায় সোয়া দুইমাস পর, সেখানে তিনি যদি কোন চিঠি লিখেও রাখেন, তা কিভাবে

পাওয়া যাবে? যদি কিছু পাওয়া যেতই তাহলে ওয়ছিয়তের সাথে পাওয়া যেত। কিন্তু ঐ মহিলার কথা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে (আল্লাহ তাকে আনন্দিত রাখুন)। কিছুদিন পর আমার নামে লেখা আমার স্বামীর সর্বশেষ পত্র হস্তগত হলো। আলহামদু লিল্লাহ।

সম্ভবত এটি তার সর্বশেষ চিঠি ছিলো - যা তার শাহাদাতের পাঁচ/সাত দিন পূর্বে লিখেছিলেন। এই চিঠি তার অভ্যাসের বিপরীত খুব দীর্ঘ ছিলো। সাধারণত তার চিঠি সংক্ষিপ্ত হত। কিছুটা সরকারী চিঠির মতো। জরুরী কিছু কাজের কথা বলেই শেষ করে দিতেন। কিন্তু এই চিঠি এমন ছিলো না। এই চিঠিতে আমার অনেক অনুল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল জীবনের শেষ দুই আড়াই মাসের কারগুজারী, এই সময়ের মধ্যে যে যে কাজ করেছেন,তার বিবরণ। তাছাড়া এই সময়ের মাঝে কিছুদিন একাকী থাকা, ক্ষুধা ও ঠান্ডার কষ্ট এবং এর দ্বারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন তাও উল্লেখ করেছেন। আরো বিভিন্ন আলোচনা যেমন - মুজাহিদের ধৈর্য ও তাকওয়ার নসিহত ইত্যাদীও চিঠিতে উল্লেখ ছিলো। সর্বশেষ কথা ছিলো "আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি কর, তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক"।

তার শাহাদাতের কিছুদিন পর এক বোন সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনি আমাকে তার বোনের একটি স্বপ্নের কথা বললেন। সে স্বপ্ন দেখেছে "একটি যুদ্ধের ময়দান। তার মধ্যখানে খুব সুন্দর একটি মহল। মহলের কারুকার্য, জিনিসপত্র এবং খাবারদাবার এত সুন্দর যা কখনো কেহ চোখে দেখেনি, কানেও শুনেনি এবং কেউ এর স্বাদও আস্বাদন করেনি। আমার স্বামী খাবার টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছেন এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন"।

আমি তো এর ব্যাখ্যা বুঝেছি যে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা তাঁর এই বান্দার সাথে উত্তম ভাবে পুরা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে মহল মানে হচ্ছে, তার কবর (হাদীস অনুযায়ী) এটি ইনশাআল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার ঘর এবং জান্নাতের বাগান সমুহের একটি বাগান।

আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন তার শাহাদাতকে কবুল করেন। জান্নাতুল ফেরদাউসে তাকে নবীগণ, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে রাখেন। তাঁর শাফাআ'ত থেকে যেন মাহরুম না করেন। আল্লাহ তা'আলার সকল উত্তম ওয়াদা তাঁর ক্ষেত্রে ও তাঁর পিতা-মাতা এবং আমদের সবার ক্ষেত্রে যেন পূরণ করেন। তার থেকে উত্তম ওয়াদা পূরণকারী আর কেউ নেই।

যেই সফর ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিলো, তা এখনো শেষ হয়নি। সফর এখনো বাকি আছে, তবে সফরসঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। ইদ্দত পালনের পর আল্লাহ তা'আলা আরেকজন মুজাহিদের সাথে সম্পর্ক জুড়িয়ে দিলেন। আমি আবারও হিজরত করলাম। এবার আমার হিজরত হলো আফগানিস্তানে। বিবাহের মধ্যে উপস্থিত সকল মুজাহিদ ও মুহাজির মহিলাগণই আমার পরিবারের ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই দুর্বল বান্দিকে সকল পরীক্ষা থেকে হেফাযত করেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঈমানকে হেফাযত রাখেন। ঈমানের উপর, সত্যের উপর, জিহাদের উপর অটল রাখেন এবং তার রাস্তায় শহিদ হওয়া থেকে মাহরুম না করেন। আমীন।

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

وصلي الله تعالي علي خير خلقه مُحَمَّد وعلي آله وصحبه أجمعين–

****